ISSN-1813-0372

বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৬

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকীয়

ত্রৈমাসিক "ইসলামী আইন ও বিচার" পত্রিকা প্রকাশনার বারো বছরে পদার্পণ করল। এক যুগের এ পথ পরিক্রমায় যুগের চাহিদা ও গবেষণাপদ্ধতির উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময়ে এ গবেষণা পত্রিকায় নানা ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক পরিসরে পত্রিকার পরিচিতি বৃদ্ধি ও র‍্যাংকিং প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার স্বার্থে এবারের সংখ্যা থেকে প্রবন্ধের শিরোনাম ও সারসংক্ষেপ বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

'ইছতিসনা' ইসলামী ফিকহে আলোচিত অন্যতম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। একপক্ষ থেকে পণ্য তৈরির ফরমায়েশ প্রদান ও অন্য পক্ষ থেকে তা সরবরাহ করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিটি শরী'আহসম্মত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের ঐকমত্য সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য মাযহাব ইছতিসনাকে বাই' সালামের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হিসেবে দেখলেও হানাফী মাযহাব একে একটি স্বতন্ত্র চুক্তির মর্যাদা দিয়েছে। অবশ্য বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করলে সালাম ও ইছতিসনার মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক পার্থক্য দৃশ্যমান হয়। পূর্বসূরী ফকীহগণ স্ববিস্তারে এ চুক্তির বিধি-বিধান ও শর্ত-শারায়েত বর্ণনা করেছেন। পদ্ধতিটি প্রাচীন হলেও সমসাময়িক বিশ্বে বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পর এর আবেদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সমকালীন প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগের আধিক্যও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো ইছতিসনা নীতিমালার ভিত্তিতে পাওয়ার প্লান্ট, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, মহাসড়কের মত বড় বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করে সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। "ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইছতিসনা বিনিয়োগঃ মূলনীতি ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ইছতিসনার ফিকহী বিধি-বিধান বর্ণনার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় এ নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাত ও ইনস্ট্রুমেন্ট বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ইছতিসনাভিত্তিক বিনিয়োগ বিস্তৃত হলেও বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং খাতে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়টি বিবেচনায় আনতে পারেন। আমরা মনে করি, ইছতিসনার ভিত্তিতে জাতীয় বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় আরও বেশি অবদান রাখা সম্ভব।

'ইসলামী অর্থব্যবস্থা' বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়বস্তু নয়। বরং বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য। ইসলামের আর্থিক জীবনদর্শন সুসম সম্পদবণ্টন, ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ও মানবতার জন্য টেকসই কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদান করায় গবেষক ও বাস্তব প্রয়োগকারী উভয় শ্রেণি এ ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। "ইসলামী অর্থব্যবস্থার অগ্রগতিঃ বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" প্রবন্ধটিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনার সাথে সাথে বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনীতির আকার, সম্পদের পরিমাণ, আমানাত সংগ্রহ, বিনিয়োগ,

অর্জিত মুনাফা, সম্পদের বিপরীতে আয়, ইসলামী ক্যাপিটাল মার্কেটের অগ্রগতি, তাকাফুল ইত্যাদি বিষয়ের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশও অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ দেশে বর্তমানে ৮টি পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যাংক, ৯টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ও ৭টি ব্যাংকের ইসলামী উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং করছে। এছাড়া রয়েছে ইসলামী জীবনবীমা ও শরী'আহভিত্তিক আর্থিক কোম্পানি। বিপুল সম্ভাবনা ও আশাব্যাঞ্জক বাস্তবতার মধ্যেও এক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে এ খাত তার কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

'অর্থনৈতিক মন্দা' সমকালীন বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত একটি বিষয়। বিগত প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে বিশ্ব ১৪টি বড় ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা প্রত্যক্ষ করেছে। সাবপ্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট থেকে উৎসারিত ২০০৭-২০০৯ সালের সর্বশেষ অর্থনৈতিক মন্দা সুদূরপ্রসারী প্রভাবের দিক থেকে পরমানবিক যুদ্ধের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ছিল। যা বিশ্ব অর্থনীতিকে এমন চরম সঙ্কট ও অস্থিরতার মুখে ঠেলে দিয়েছে যে অর্ধযুগ অতিবাহিত হলেও এখনও বিশ্ব অর্থনীতি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সুদভিত্তিক বাজার অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতিই এর মূলকারণ। ঋণবিক্রি, কৃত্রিম ও অবাস্তব লেনদেন, কৃত্রিম মুদ্রাসৃষ্টি, ফটকাবাজিসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক খাতকে কলুষিত করেছে। এর বিপরীতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম প্রণয়ন করেছে এক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মন্দা প্রতিরোধে এর কৌশল চিরন্তন। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে ইসলামী কৌশলসমূহের সমন্বিত প্রয়োগ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার গ্যারান্টি দেয়। "বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণ ও প্রতিকার: ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধে গবেষক দেখিয়েছেন কিভাবে ইসলামী ব্যবস্থা অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। অর্থনীতির বৃহৎ অংশ হিসেবে ব্যাংকিং খাত বৈশ্বিক মন্দা সৃষ্টি ও প্রতিকারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। অতএব ব্যাংকিংকে শরী'আহ নীতিমালায় পরিচালিত করতে পারলে অর্থনৈতিক মন্দার অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

বিগত শতাব্দিতে যেসব ইসলামী মনীষী মুসলিম মানসে ইসলামী মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্পৃহা তৈরির নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯খ্রি.)। তিনি ইলমুল হাদীসের পণ্ডিত হিসেবে সমধিক পরিচিত। হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা বিশ্লেষণ, সহীহ, দুর্বল, জাল হাদীস নিরূপণে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। সমকালীন বিশ্বে হাদীসের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। হাদীসের উৎস ও সনদ যাচাই-বাছাই, সনদের মাননির্ণয়, হাদীসের শ্রেণিভুক্তকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখার পাশাপাশি শায়খ আলবানী হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান বর্ণনার প্রয়াসও নিয়েছেন। এ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা, হাদীসের সংকলনসমূহে শর'ঈ বিধান উল্লেখ এবং হাদীস তাখরীজের কিতাবসমূহে শর'ঈ বিধান বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর এ প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায়। "হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নিরূপণে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদান: মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছে। একজন অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের খাতসমূহ সম্পর্কেও ইসলামের রয়েছে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের সামগ্রিক মালিকানা মহান আল্লাহর, যাতে তিনি বান্দার প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করেছেন। এ কারণে প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ শুধুমাত্র সম্পদের মূল মালিক আল্লাহর অনুমোদিত খাতেই তার সম্পদ ব্যয় করতে পারে। "কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইনফাক" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে মহান আল্লাহর অনুমোদিত সম্পদ ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি ব্যয়ের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, শর্ত, নীতিমালা ও পদ্ধতিও আলোচনা করা হয়েছে। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে শরী'আহ নীতিমালা অনুসরণ করা হলে একদিকে সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হবে অন্যদিকে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়ের উপর রচিত ইসলামী আইন ও বিচারের এ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ সকলের সুকৃতিসমূহ কবুল করুন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

দৃষ্টি আকর্ষণ

সম্মানিত লেখকগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক পরিসরে "ইসলামী আইন ও বিচার" পত্রিকার পরিচিতি বৃদ্ধি ও র‍্যাংকিং প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার স্বার্থে ৪৫তম সংখ্যা থেকে প্রবন্ধের শিরোনাম ও সারসংক্ষেপ বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অতএব প্রবন্ধ প্রেরণের সময় শিরোনাম, লেখকের নাম, সারসংক্ষেপ ও মূলশব্দ বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি অনুবাদ দেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

-ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইছতিসনা বিনিয়োগ: মূলনীতি ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান*

Istisnā' Investment in Islamic Banking: Analyses of Principles and Application

ABSTRACT

In contemporary Islamic Banking Industry istisnā' as an investment product has gained familiarity. Istisnā' (عقد الاستصناع) can be defined as a contract to construct something within a stipulated timeframe and in a certain manner. Istisnā' contract is appropriate for provioing liquidity for construction projects which has been proposed or is in the process of being built. In many countries nowadays large construction projects including power plants, airports, seaports, highways etc. are financed using istisnā' contract. This paper aims to discuss and analyze the definition of istisnā' its legal analyses, application and investment sectors of istisnā' in Islamic Banking system. Employing descriptive and analytical methods, the paper facilitating the understanding of various key issues related to istisnā' and its practical application by Islamic banks and financial institutions as well as procedures of issuing and investing istisnā' sukūk.

Keywords: Istisnā'; istisnā' investment; Islamic banking; infrastructural development; istisnā' sukūk.

সারসংক্ষেপ

সমসাময়িক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সেবা হিসেবে 'ইছতিসনা বিনিয়োগ' অতি পরিচিত একটি নাম। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোন কিছু নির্মাণকল্পে অনুরোধ কিংবা চুক্তি করার নাম হচ্ছে ইছতিসনা (عقد الاستصناع)। পরিকল্পনাধীন কিংবা নির্মাণাধীন কোন

* পিএইচডি গবেষক, ফিক্‌হ ও উসূল আল-ফিক্‌হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রকল্পে প্রয়োজনীয় তারল্য সরবরাহ করার জন্য ইছতিসনা চুক্তি একটি উপযুক্ত মাধ্যম। অনেক দেশেই বর্তমানে পাওয়ার প্লান্ট, বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও মহাসড়কসহ বড় বড় প্রকল্পে ইছতিসনা চুক্তির মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইছতিসনা চুক্তির পরিচয়, আইনী পর্যালোচনা, বাস্তবিক প্রয়োগ, ইসলামী ব্যাংকিং এ ইছতিসনার আলোকে বিনিয়োগের খাত ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে ইছতিসনার বিভিন্ন অনুষঙ্গ অবগত হওয়ার পাশাপাশি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষত ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানে এর বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি এবং ইছতিসনা সুকূকের ইস্যু ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া জানা যাবে।
মূলশব্দ: ইছতিসনা; ইছতিসনা বিনিয়োগ; ইসলামী ব্যাংকিং; অবকাঠামোগত উন্নয়ন; ইছতিসনা সুকূক।

ভূমিকা

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইছতিসনা চুক্তির গুরুত্ব ও ব্যবহার অপরিসীম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বড় বড় নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংকগুলো ইছতিসনা বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দিচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপন, মহাসড়ক, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও জাহাজ নির্মাণ এবং পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনসহ বড় বড় প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগের প্রয়োগ হয়ে থাকে। তাই ইছতিসনা'র পরিচয়, মূলনীতি, আইনী আলোচনা, বাস্তব প্রয়োগ, ইসলামী ব্যাংকিং এ ইছতিসনার আলোকে বিনিয়োগ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে।

সাধারণত ইছতিসনা বলতে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিতে কোন কিছু তৈরি করে দেয়ার আদেশ, অনুরোধ কিংবা চুক্তি ইত্যাদি বুঝায়। প্রাচীনকাল থেকেই এটি প্রচলিত ছিল। কোন জনগোষ্ঠীর মাঝে যখন কেউ বিশেষ কোন কিছু তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করত, তখন জাতির সবাই উক্ত বস্তুটি তৈরিকল্পে তার শরণাপন্ন হত এবং বিনিময়ে উক্ত ব্যক্তি তার প্রয়োজনের নিরিখে অপর কোন বস্তু গ্রহণ করত। বর্তমানেও এ ধরনের বিনিময়ের প্রচলন রয়েছে। টাকা কিংবা মূল্যবান অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে প্রয়োজনীয় কিছুর নির্মাণে এখনো মানুষ সংশ্লিষ্ট দক্ষ কারিগরের দ্বারস্থ হয়। অলস বসে না থেকে কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতে এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপরকণ অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে কিংবা প্রয়োজনীয় শ্রম দিতে ইসলামে সর্বদা উৎসাহ দেয়া হয়েছে। রাসূল স. বলেন:

إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

> আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন যখন তোমরা কোন কাজ করবে তা সর্বোত্তম উপায়ে করবে।[১]

---

[১] আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাক্বী, *শু'আবুল ঈমান*, অধ্যায়: আল-আমানাত, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০, হাদীস নং ৫৩১২, খ. ৪, পৃ. ৩৩৪

আর তা কৃষি, শিল্প, কারিগরী কিংবা যে কোন প্রয়োজনীয় কাজ হতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজের কাজ নিজে করতেন।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

আর আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই মর্মে আদেশ প্রদান করত: হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষীসকল তোমরাও। আর আমি তার জন্য লৌহকে নরম করে দিলাম। (তাকে আমি বলেছিলাম যে, উক্ত বিগলিত লোহা দ্বারা) তুমি প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর এবং সেগুলোর কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর, (কিন্তু এ শিল্পগত কলাকৌশলের পাশাপাশি) তোমরা তোমাদের সৎকর্মও অব্যাহত রাখ। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আমি তা দেখতে পাই।[২]

উক্ত আয়াতের সমর্থনে রাসূল স. বলেন:

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده

মানুষ যা ভক্ষণ করে তন্মধ্যে সর্বোত্তম খাদ্য হচ্ছে যা সে নিজ হাতে উপার্জন করে। আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজ হাতের উপার্জিত খাবার দিয়ে আহার করতেন।[৩]

ইবনে হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, "দাউদ আ. কামার ছিলেন। তিনি লোহা গলিয়ে বর্ম, ঢাল, তরবারি ইত্যাদি নির্মাণ করতেন। এছাড়াও আদম আ. কৃষিকাজ, নূহ আ. কাঠমিস্ত্রি এবং ইদ্রিস আ. সেলাইকর্ম করতেন।"[৪] ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, রোম, পারস্য, ইয়ামেন ইত্যাদি জনপদেও শিল্প, নির্মাণকর্ম, কারিগরি এসবের প্রচলন ছিল। মাযহাবের বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলের স. যুগেও ইছতিসনা পদ্ধতি চালু ছিল।[৫] রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জন্য একটি মিম্বার ও সিলমোহর (মোহরাঙ্কিত আংটি) তৈরি করে দিতে জনৈক কারিগরকে অনুরোধ করেছিলেন।[৬] শামসুল আইয়িম্মাহ

---

২. আল-কুরআন, ৩৪ : ১০, ১১

৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব আল-বুয়ূ', বাবু কাসবুর রাজুল ওয়া আমালুহু বি ইয়াদিহি, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০২, হাদীস নং ২০৭২, খ. ২, পৃ. ১০

৪. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭, খ. ৪, পৃ. ৩৮৪

৫. নাসের আহমাদ ইব্রাহীম আন্-নাশওয়ী, *আহকাম আক্দ আল-ইছতিসনা ফি আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, আলেকজান্দ্রিয়া: দারুল জামে'য়া আল-জাদীদাহ, ২০০৫, পৃ. ৮৭

৬. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, বাব আল-ইসতিআনাহ বি আন্-নাজ্জার ওয়া আস্-সুন্নাআ ফি আওয়াদিল মিম্বার ওয়াল মাসজিদ, বাব খাওয়াতীম আয্-যাহাব, এবং বাব

আস-সারাখসী (মৃ. ৪৯০ হি.) বলেন, "এতে কোন দ্বিমত নেই, ইছতিসনা তথা বিভিন্ন বস্তু তৈরির ফরমায়েশ দানের রীতি রাসূলের সা. যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধিও চালু রয়েছে।"[৭]

ইছতিসনার সংজ্ঞা ও পরিচয়

আভিধানিক অর্থে ইছতিসনা (استصناع) শব্দটি 'সিনা'আত' (صناعة) থেকে এসেছে, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার অর্থ, শিল্প, নির্মাণ ইত্যাদি। সুতরাং ইছতিসনা (ইসতিফআল এর আলোকে) শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোন কিছু নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ করা কিংবা সংশ্লিষ্ট নির্মাতার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

ইছতিসনার পারিভাষিক সংজ্ঞায় বিভিন্ন মত পাওয়া যায়, যা মূলত ইছতিসনা চুক্তির প্রকৃতি এবং অন্তর্নিহিত অর্থের ভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। কেউ কেউ মনে করেন, ইছতিসনা কোন বিনিময় চুক্তি নয়; বরং সংশ্লিষ্ট দু'পক্ষের মধ্যকার প্রতিশ্রুতি, যা প্রস্তাবনা (ইজাব) এবং সম্মতির (কবুল) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, উভয় পক্ষ তা পালন ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। অপরদিকে কতক স্কলারের বক্তব্য হচ্ছে, ইছতিসনা বিনিময় চুক্তি; কিন্তু এর বাস্তবায়ন উভয় পক্ষের উপর আবশ্যক নয়, বরং প্রয়োজনের আলোকে তারা এ চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে ইছতিসনা একটি স্বতন্ত্র চুক্তি, যা অপরাপর চুক্তি থেকে ভিন্ন। যদিও সালাম চুক্তির (عقد السلم) সাথে ইছতিসনার কিছুটা মিল রয়েছে, কিন্তু এটি সালাম[৮], ছারাফ[৯] ইত্যাদি চুক্তি থেকে ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র চুক্তি। সালাম চুক্তির ন্যায় ইছতিসনা চুক্তিতেও বিক্রিত বস্তু সংক্রান্ত ইসলামের সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইসলামী আইনে বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ, সালাম ও ইছতিসনার ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্য বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও সর্বজনের প্রয়োজন বিবেচনায় তা বৈধ করা হয়েছে এবং উক্ত বৈধতার উপর মুসলিম মনীষীগণ সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১০]

খাতম আল-ফিদ্দাহ, হাদীস নং: ৪৩৮, ৮৭৬, ১৯৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২, ৫৫২৭, ৫৫২৮, ৫৫২৯, ৫৫৩৫, ৫৫৩৮, ৬৮৬৮ ইত্যাদি। হাদীসটি বিস্তারিতভাবে পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯, খ. ১২, পৃ. ১৩৮

৮. بيع السلعة الآجلة الموصوفة بثمن عاجل
অর্থাৎ নগদ টাকা দিয়ে এমন বস্তু ক্রয় করা, যা বেশ কিছুদিন পরে সরবরাহ করা হবে; কিন্তু চুক্তিপত্রে তার পরিমাণ, গুণাগুণ, শ্রেণি, প্রকার, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যা বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে পরবর্তীতে কোন দ্বিমত সৃষ্টি না হয়।

৯. بيع النقد بالنقد অর্থাৎ: মুদ্রা বিনিময় চুক্তি, (Money Exchange)।

১০. মুস্তফা আহমদ আয-যারক্বা, "আক্দ আল-ইছতিসনা ওয়া মাদা আহমিয়াতুহা ফিল ইছতিছমারাত আল-মু'য়াসারাহ", *মাজাল্লাহ মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২

হানাফী ফাকীহগণের মতে ইছতিসনা হলো:

عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ شُرِطَ فِيهِ الْعَمَلُ

বিক্রেতার দায়-দায়িত্বে নির্মাণের শর্তে পণ্যের বিনিময় চুক্তি।

ইবনু আবিদীন (মৃ. ১২৫২ হি.) ইছতিসনার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

والاستصناع هو طلب عمل الصنعة بأجل، ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোন কিছু নির্মাণকল্পে অনুরোধ কিংবা চুক্তি করার নাম হচ্ছে ইছতিসনা। উল্লেখ্য যে, কাঙ্খিত বস্তু ডেলিভারি দেয়ার ক্ষেত্রে তাড়া দেয়ার জন্য নয়; বরং তা নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় সময় হিসেবেই এখানে চুক্তির সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। অন্যথায় এটি সালাম চুক্তিতুল্য হয়ে যাবে যেখানে মূলত নির্মাণ নয়; বরং ডেলিভারির লক্ষ্যেই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।[১১]

উসমানিয়া খিলাফত প্রণীত শরীয়াহ ম্যানুয়াল *'আল-মাজাল্লাহ'*[১২] এর ৩৮৮ নং ধারায় ইছতিসনা'র পরিচয় দেয়া হয়েছে:

إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا. مثلا لو تقاول مع نجار على أنه يصنع له زورقا أو سفينة ويبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع

কোন ব্যক্তি যদি কোন নির্মাতা বা কারিগরের নিকট গিয়ে বলে, আমাকে উক্ত বস্তুটি এত টাকার বিনিময়ে তৈরি করে দাও, এবং সংশ্লিষ্ট কারিগর তা গ্রহণ করে,

---

(১৯৯২), পৃ. ২৩৪; যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক শরহে কানয আদ-দাক্বায়েক*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭, খ. ৬, পৃ. ২৮৩

১১. মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবুদল আযীয ইবনে আবেদীন আদ্-দামেস্কী, *রাদ্দুল মুহতার আল-মা'রুফ বি হাশিয়াত ইবনে আবেদীন*, বৈরুত: দারু এহইয়া আত-তুরাছ আল-আরবী, ১৯৯৮, খ. ৭, পৃ. ৩৬৫

১২. এর পুরো নাম হচ্ছে *'মাজাল্লাত আল-আহকাম আল-আদলিয়্যাহ'*, যা উসমানিয়া খিলাফতের সংস্কার যুগে আইনী সংস্কারের অংশ হিসেবে ১৮৬৯ এবং ১৮৭৬ ইং সালের মধ্যবর্তী সময়ে রচনা করা হয়। ইসলামী আইনের কডিফিকেশন বা বিধিবদ্ধ আকারে সংকলন এর ক্ষেত্রে তুলনামূলক সফল পদক্ষেপ হিসেবে মাজাল্লাহ সুপরিচিত। এতে হানাফী ফিক্‌হ এর মু'আমালাত (civil transactions) সেকশনকে কডিফাইড তথা আইনী কোড হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাজাল্লাহ'তে সর্বমোট ১৮৫১ টি ধারা রয়েছে, যেখানে ক্রয়-বিক্রয় থেকে শুরু করে লিজ, গ্যারান্টি, এজেন্সি, দায়বদ্ধতা হস্তান্তর, মর্টগেজ, পার্টনারশিপ, আমানাতসহ বিভিন্ন প্রকারের চুক্তি ও লেনদেন বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ে লেখকের একটি গবেষণা থেকে উঠে এসেছে, যদিও মাজাল্লাহ হানাফী ফিক্‌হ এর আলোকে রচিত, তথাপিও এখানকার প্রায় সকল (৯৩%) ধারা ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ সকল কিংবা অধিকাংশ মাযহাবের মতামতের সাথে সহমত পোষণ করে থাকে।

> তাদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তির নাম ইছতিসনা। যেমন: কোন ব্যক্তি নির্ধারিত দৈঘ্য-প্রস্থ, ডিজাইন, স্টাইল ইত্যাদি বর্ণনাপূর্বক কোন নির্মাতার নিকট একটি জাহাজ কিংবা নৌকা নির্মাণের প্রস্তাব করলে সংশ্লিষ্ট নির্মাতা তাতে সম্মত হলে তাদের মাঝে ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন হয়।[১৩]

হানাফী ব্যতীত অন্যান্য মাযহাবের দৃষ্টিতে, ইছতিসনা ও সালাম উভয়ই এক ও অভিন্ন চুক্তি। তাই এ সকল মাযহাবে ইছতিসনার স্বতন্ত্র কোন সংজ্ঞা ও পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং এ সকল মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থসমূহে সালাম এর অন্তর্ভুক্ত একটি অনুচ্ছেদ হিসেবে ইছতিসনার আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে ইছতিসনা চুক্তিকে নির্মিত পণ্য-বস্তুতে সালাম চুক্তির প্রয়োগ হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই এ সকল মাযহাবে সালাম সংক্রান্ত সকল নীতিমালা ও শর্তাবলি ইছতিসনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে বিবেচিত।[১৪]

মালিকী মাযহাবে সালাম এর অধ্যায়ে ইছতিসনার আলোচনা করা হয়েছে।[১৫] আল-মুদাওয়ানাহ গ্রন্থে ইসতিছনা'র আলোচনা সংক্রান্ত স্থানে শিরোনাম দেয়া হয়েছে *'আস্-সালাফ ফি আস্-সিনা'আত'* (السلف في الصناعة) অর্থাৎ শিল্প পণ্যে সালাম এর প্রয়োগ।[১৬] একই ভাবে কাযী ইবনু রুশ্দ (৪৫০-৫২০ হি.) তার মুক্বাদ্দিমাত গ্রন্থে শিরোনাম দিয়েছেন *'আছ-সালাম ফি আস্-সিনা'আত'* (السلم في الصناعة) অর্থাৎ শিল্প-কারখানায় নির্মিত পণ্যে সালামের ব্যবহার সংক্রান্ত অধ্যায়।[১৭] সুতরাং অত্র মাযহাবে শিল্প-কারখানায় নির্মিত বস্তুতে সালামের ব্যবহার প্রসঙ্গে ইছতিসনার আলোচনা করা হয়েছে।[১৮]

অনুরূপভাবে শাফিয়ী মাযহাবেও স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে ইছতিসনার আলোচনা করা হয়নি; বরং সালাম এর প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে এর অন্তর্গত একটি অধ্যায় হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। শাফিয়ী ফকীহ আশ্-শিরাযী (মৃ. ৪৭৬ হি.) বলেন:

> ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأثمان والحبوب والثمار والدواب والعبيد والجواري والأصواف والأشعار والأخشاب والأحجار والطين والفخار والحديد والرصاص والبلور والزجاج، وغير ذلك من الأموال التي تباع وتضبط بالصفات

---

১৩. *আল-মাজাল্লাহ*, বৈরূত: *মাতবা'আহ আল-আদবিয়্যাহ*, ১৩০২ হি., পৃ. ৬৭

১৪. আয-যারক্বা, আক্দ আল-ইছতিসনা, পৃ. ২৩৪

১৫. আহমদ ইবনে আরাফাহ আদ-দাছূক্বী, *হাশিয়াত আদ্-দাছূক্বী আলা শরহে কাবীর*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৩, খ. ৪, পৃ.৩৫০

১৬. মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুদাওয়ানাহ আল-কুবরা*, কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৫, খ. ৪, পৃ. ২২

১৭. ইবেন রুশদ, *আল-মুক্বাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত*, বৈরূত: দারুল গারব আল-ইসলামী, ১৯৯৮, খ. ২, পৃ. ৩২

১৮. আলী আছ্-ছালূছ, "আক্দ আল-ইছতিসনা", *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২ (১৯৯২), পৃ. ২৬২

> যে সকল বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং যা বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা যায়, এ সকল কিছুতে সালাম চুক্তির প্রয়োগ বৈধ। যেমন: শস্যদানা, ফল-ফলাদি, জীব-জন্তু, পশম, চুল, কাঠ, পাথর, কাচা ও পাকা মাটি, লৌহ, ইস্পাত, শিষা, কাঁচ ইত্যাদি।[১৯]

হাম্বলী মাযহাবেও ছালামের অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক হিসেবে ইছতিসনা'র আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য কতিপয় হাম্বলী ফকীহ ইছতিসনাকে বৈধ চুক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। তাদের মতে সালাম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন উপায়ে উপস্থিত কিংবা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেন-দেন নিষিদ্ধ।[২০]

জেদ্দাস্থ ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমির ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তে ইছতিসনার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:

إن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة

> ইছতিসনা চুক্তি হচ্ছে যা সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়বদ্ধতায় বিদ্যমান নির্মাণ কাজ ও নির্মিতব্য পণ্যের উপর প্রযোজ্য।[২১]
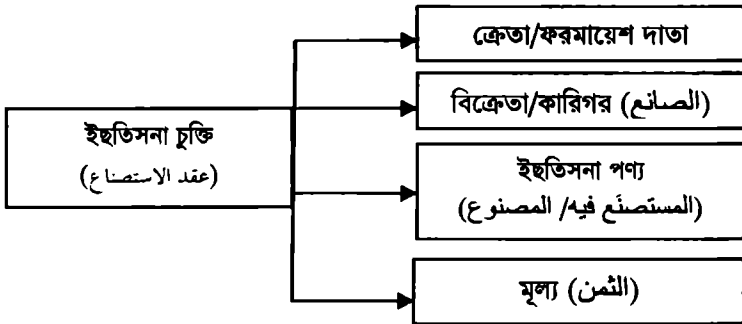
চিত্র ০১: ইছতিসনা চুক্তির মূল স্তম্ভসমূহ[২২]

ইছতিসনা ও সালাম

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হানাফী মাযহাব ব্যতিরেকে অন্য সকল মাযহাবের মতে ইছতিসনা এবং সালাম উভয়ই এক ও অভিন্ন চুক্তি। ইছতিসনা শুধুমাত্র সালামের প্রাসঙ্গিক একটি চুক্তি, যা শিল্প-কারখানায় নির্মিত পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে

---

১৯. আবু ইছহাক ইব্রাহীম আশ্-শিরাযী, *আল-মুহায্যাব ফি ফিক্‌হি আল-ইমাম শাফেয়ী*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ২, পৃ. ৭২.

২০. আছ্-ছালূছ, "আক্‌দ আল-ইছতিসনা", পৃ. ২৬৯

২১. মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী, খ. ৭, ২ (১৯৯২), পৃ. ৭৭৭

২২. নিজস্ব চিত্রায়ন।

হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে, ইছতিসনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক একটি চুক্তি। প্রকৃতপক্ষে ইছতিসনা ও সালাম দু'টি ভিন্ন চুক্তি হলেও কয়েকটি বিষয়ে এ দু'য়ের মাঝে মিলও রয়েছে। নিম্নের সারণির মাধ্যমে ইছতিসনা ও ছালামের মাঝে মিল ও অমিল সুস্পষ্ট করা হলো:

মিল	অমিল
১. ইছতিসনা ও সালাম উভয় চুক্তির ক্ষেত্রে পণ্যের শ্রেণি, ধরন, প্রকার, গুণাগুণ ইত্যাদির বর্ণনা সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে; কারণ উভয়ই হচ্ছে বিক্রিত পণ্য (sold object/مبيع), আর বিক্রিত পণ্য উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে নির্দিষ্ট ও পরিচিত হওয়া আবশ্যক। ২. ইছতিসনা ও সালাম উভয় চুক্তিতে উপস্থিত বা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেনদেন হয়, যা প্রয়োজনের নিরিখে ব্যতিক্রম হিসেবে বৈধ করা হয়েছে। ৩. ইছতিসনা ও সালাম উভয় চুক্তি সুদের সংশ্লিষ্ট থেকে মুক্ত হতে হয়। যেমন: একই জাতীয় পণ্য বাকীতে কিংবা নগদে কম-বেশি করে লেনদেন করা যাবে না। ৪. উভয় চুক্তিতে মূল্য (price) পণ্যের শ্রেণি, প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ইত্যাদির বর্ণনা সহ সুনির্দিষ্ট ও পরিচিত হতে হবে। অন্যথায় অনিশ্চয়তা (ambiguity/غرر) ও অজ্ঞতার (ignorance/جهالة) কারণে সংশ্লিষ্ট চুক্তি বাতিল ও অবৈধ চুক্তিতে পরিণত হবে।	১. সালাম পণ্যের (salam commodity) ক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় নির্মিত হয় এমন পণ্য হওয়া আবশ্যক নয়; বরং অধিকাংশ সময় খাবার জাতীয় পণ্য, জীব-জন্তু ইত্যাদিতে সালাম চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে। অপরদিকে ইছতিসনা পণ্য (istisna commodity) অবশ্যই শিল্প-কারখানায় নির্মিত হয় এমন পণ্য হতে হবে। ২. সালাম সাধারণত তুলনীয় কিংবা সাদৃশ্যপূর্ণ (comparable/مثلي) পণ্য-দ্রব্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অপরদিকে ইছতিসনা তুলনীয় এবং তুলনীয় নয় (nonfungible/قيمي) উভয় জাতীয় পণ্য-দ্রব্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ৩. সালাম অবশ্য পালনীয় (binding) এবং বাতিলযোগ্য নয় (irrevocable) এমন চুক্তি, যা শুধুমাত্র এক পক্ষের ইচ্ছায় বাতিল করা যায় না। অপরদিকে ইছতিসনা চুক্তি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেন, এটি বাতিলযোগ্য চুক্তি (revocable), সংশ্লিষ্ট পক্ষের যে কেউ ইচ্ছে করলে এ চুক্তি বাতিল করতে পারবে। অপর একটি মত হচ্ছে, অন্যান্য সকল বিনিময় চুক্তির ন্যায় এটিও অবশ্য পালনীয় (binding) চুক্তি। ৪. প্রচলিত হউক কিংবা না হউক সকল পণ্যে সালাম চুক্তি প্রযোজ্য। অপরদিকে শুধুমাত্র যা সমাজে প্রচলিত সে সকল পণ্যে ইছতিসনা প্রযোজ্য। ৫. সালাম পণ্য মূলত ঋণ (debt/دين) হিসেবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়বদ্ধতায় (liability)

	বিদ্যমান থাকে এবং এটি এমন পণ্য যা পরিমাপ, ওজন, গণনা, সংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে সুনির্দিষ্ট করা যায়। অপরদিকে ইছতিসনা পণ্য কোন ঋণ নয়; বরং একটি স্থাবর পণ্য বা এসেট (corporeal/عين) হয়ে থাকে, যা প্রয়োজনীয় গুণাগুণের আলোকে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়বদ্ধতায় সুনির্দিষ্ট থাকে, যেমন নির্মিতব্য আসবাবপত্র, জুতা, পাত্র ইত্যাদি।
	৬. সালাম চুক্তিতে পণ্য সরবরাহের একটি সুনির্দিষ্ট সময় (future period/أجل) থাকা আবশ্যক, যা একটু দীর্ঘ হয়। তবে শাফেয়ী মাযহাবের মতানুযায়ী তা আবশ্যক নয়; কারণ তাদের মতে নগদ সালাম (السلم الحال) তথা চুক্তি হওয়ার প্রাক্কালেও পণ্য ডেলিভারি বৈধ। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফার মতানুযায়ী ইছতিসনা চুক্তিতে কোন নির্ধারিত সময়সীমা থাকার অবকাশ নেই, এমনটি হলে তা সালাম চুক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে।
	৭. সালাম চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে উক্ত বৈঠকেই সালামের মূলধন তথা মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অবশ্যই মালিকী মাযহাবের মতানুযায়ী তিন দিন পর্যন্ত সুযোগ দেয়ার অবকাশ রয়েছে। অপরদিকে ইছতিসনা চুক্তির মূল্য পরিশোধ প্রচলিত রীতি-নীতির উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কিছু অংশ হয়ত চুক্তি হওয়ার সময়ে, কিছু অংশ মাঝামাঝি সময়ে, এবং বাকি অংশ পণ্য ডেলিভারী নেয়ার সময় পরিশোধ করা যেতে পারে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে যা প্রচলিত তাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

সারণি ০১: ইছতিসনা ও সালাম চুক্তির মাঝে মিল ও অমিল[২৩]

---

২৩. নিজস্ব চিত্রায়ন। বিস্তারিত দেখুন: ইব্রাহীম আন্-নাশওয়ী, *আহকাম আক্দ আল-ইছতিসনা*, পৃ. ৩১৫-৩১৮

ইছতিসনা'র শর'ঈ বিধান

ইসলামী আইনের আলোকে ইছতিসনা সম্পূর্ণভাবে বৈধ ও আইনী ক্রটিমুক্ত একটি বাণিজ্য চুক্তি। বাহ্যিকভাবে ইছতিসনার বৈধতা নিয়ে ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর মধ্যে মতানৈক্য অনুভূত হলেও, বাস্তবিকভাবে ইছতিসনার বৈধতার বিষয়ে সবাই সহমত পোষণ করেন। শুধুমাত্র হানাফী মাযহাব ইছতিসনা চুক্তিকে একটি স্বতন্ত্র চুক্তি হিসেবে এবং অপরাপর মাযহাব এটিকে সালাম চুক্তির অংশবিশেষ হিসেবে পরিগণিত করেন। তবে আইনগত বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ইছতিসনা চুক্তি ইসলামী শরীয়াহসম্মত ও বৈধ।

অনুপস্থিত কিংবা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেনদেন ইসলামে নিষিদ্ধ করা হলেও, সালাম ও ইছতিসনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে তা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। হানাফী মাযহাব ইসতিহসান[২৪] এবং সমাজে প্রচলিত সার্বজনীন ব্যবহারের আলোকে ইছতিসনার বৈধতার অনুমোদন দিয়েছে। উপরন্তু, রাসূল সা. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তু নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারিগরের সাথে নির্মাণচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি চিকিৎসার জন্য শিঙ্গা নিয়েছিলেন, যদিও সেখানে ব্যবহৃত শিঙ্গার পরিমাণ এবং সময় ইত্যাদি অনির্ধারিত ছিল। যুগ যুগ ধরে মানব সমাজে মশ্ক থেকে পানি পান করা, পাবলিক ওয়াশরুম ব্যবহার করা ইত্যাদির প্রচলন হয়ে আসছে, যদিও সেখানে পানির পরিমাণ, ওয়াশরুমে অবস্থানের সময় ইত্যাদি অনির্দিষ্ট ও অনির্ধারিত থাকে। সুতরাং এর থেকে প্রতীয়মান হয়, অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ও বিদ্যমান নয় এমন বস্তুকেও আইনের দৃষ্টিতে উপস্থিত এবং বিদ্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।[২৫]

---

[২৪] ترك القياس تحقيقا لمقصد الشارع، العدول بالمسئلة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول
মাকাসিদ শরীয়াহ'র বাস্তবায়ন তথা জনকল্যাণ অর্জন এবং জনদুর্ভোগ প্রতিহত করার লক্ষ্যে সাধারণ যুক্তি/বিধান পরিহার করার নাম হচ্ছে ইসতিহসান। অন্য ভাষায়: শক্তিশালী, সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত কোন প্রয়োজনের/যুক্তির নিরিখে সাধারণ ও প্রচলিত বিধান পরিত্যাগ করে অপর একটি বিধান গ্রহণ করা হচ্ছে ইসতিহসান। Juristic Preference, Application of discretion in a legal decision.

[২৫] আলাউদ্দিন আবু বাকর আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে ফি তারতীব আশ্-শারায়ে*, কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৫, খ. ৭, পৃ. ১০৯; বদরুদ্দীন আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহে আল-হিদায়াহ*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ৮, পৃ. ৩৭৩; ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক*, খ. ৬, পৃ. ২৮৩; কামাল ইবনে হুমাম, *শরহে ফাতহুল ক্বাদীর*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ৭, পৃ. ১০৮; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ২০১০, খ. ৩, পৃ. ১৯৫

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال: إن شئت، فعملت المنبر

জনৈক মহিলা রাসূলকে স. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার এক কাঠমিস্ত্রি দাস আছে, আমি কি আপনার জন্য একটি মিম্বার তৈরি করে দেব, যেখানে বসে আপনি খুতবা দিতে পারবেন? রাসূল সা. বললেন: তুমি চাইলে তা করতে পার। তখনে সে একটি মিম্বার তৈরি করে দিল।[২৬]

ইমাম বুখারী অত্র হাদীছের উপর যে শিরোনাম দিয়েছেন তা হচ্ছে: (باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد) অর্থাৎ: মসজিদ, মিম্বার ইত্যাদি নির্মাণে কাঠমিস্ত্রি ও কারিগর থেকে সহযোগিতা নেয়া প্রসঙ্গে।

হানাফী ফকীহ আল-কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন:

فالقياس يأبى جواز الاستصناع؛ لأنه بيع المعدوم كالسلم بل هو أبعد جوازا من السلم؛ لأن المسلم فيه تحتمله الذمة؛ لأنه دين حقيقة ، والمستصنع عين توجد في الثاني، والأعيان لا تحتملها الذمة فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس عن السلم وفي الاستحسان جاز؛ لأن الناس تعاملوه في سائر الأعصار من غير نكير فكان إجماعا منهم على الجواز فيترك القياس.

সাধারণ যুক্তির দৃষ্টিতে ইছতিসনা অবৈধ। সালাম চুক্তির ন্যায় এখানেও অনুপস্থিত এবং বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর সাথে লেনদেন হয়। উপরন্তু, সালাম থেকেও ইছতিসনা অবৈধ হওয়ার বেশি সম্ভাবনা রাখে; কারণ সালামে পণ্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়বদ্ধতায় থাকে এবং তা সত্যিকার অর্থে ঋণ। অপরদিকে ইছতিসনা পণ্য সাধারণত স্থাবর সম্পদ হয়ে থাকে, যা কারো দায়বদ্ধতায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। এ দৃষ্টিতে সাধারণ যুক্তির আলোকে সালামের তুলনায় ইছতিসনা চুক্তি বৈধ হওয়ার কম সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু ইসতিহ্সানের আলোকে ইছতিসনার বৈধতা দেয়া হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ কোন দ্বিমত ব্যতিরেকে ইছতিসনার চর্চা করে আসছে, সুতরাং এর বৈধতার ব্যাপারে সবাই একমত। সার্বিক এ ঐকমত্যের বিপরীতে সাধারণ যুক্তি বিবেচনা অগ্রাহ্য বলে গণ্য হবে।[২৭]

এ প্রসংগে ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.) ও ইবনে কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১ হি.) এর একটি মতামত উল্লেখযোগ্য। তাদের মতে, ইছতিসনা ও সালাম চুক্তি ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়; বরং এটিই সাধারণ আইন হিসেবে বিবেচিত। শুধুমাত্র অনুপস্থিত কিংবা বিদ্যমান নয় এমন কোন বস্তুর লেনদেন

---

২৬. আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, বাব আল-ইসতিআনাহ বি আন্-নাজ্জার ওয়া আস্-সুন্নাআ ফি আওয়াদিল মিম্বার ওয়াল মাসজিদ, হাদীস নং: ৪৩৮, ৮৭৬, ১৯৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২

২৭. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১০৯

ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়নি; বরং যা উপযুক্ত সময়ে ডেলিভারি তথা হস্তান্তর করা সম্ভবপর নয় সে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনিশ্চয়তা কিংবা রিস্ক (ambiguity/غرر) তথা যে কারণে কোন বস্তুর লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা বিদ্যমান বা অস্তিত্বে থাকা কিংবা না থাকার সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং তা ডেলিভারি দিতে সম্ভব হওয়া কিংবা না হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তাই সালাম, ইছতিসনা ইত্যাদি চুক্তিতে বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করা হয়েছে; কারণ সংশ্লিষ্ট পণ্য চুক্তি হওয়ার প্রাক্কালে বিদ্যমান না থাকলেও ডেলিভারি দেয়ার সময় তা বিদ্যমান হয়ে যাবে এবং যথাসময়ে হস্তান্তর করা সম্ভবপর হবে। ইবনে কাইয়্যিম বলেন:

> ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز بلفظ عام ولا بمعنى عام وإنما في السنة النهي عن بيع الأشياء التي هي معدومة كما في النهي عن بعض الأشياء الموجودة فليست العلة في المنع العدم ولا الوجود بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر وهو ما لا يقدر على تسليمه سواء أكان موجودا أم معدوما كبيع العبد الآبق والبعير الشارد وإن كان موجودا إذ موجب البيع تسليم المبيع فإذا كان البائع عاجزا عن تسليمه فهو غرر ومخاطره وقمار

> আল্লাহর কিতাব, রাসূলের স. সুন্নাহ, কিংবা সাহাবাদের বক্তব্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যেখানে অস্তিত্ব কিংবা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সাধারণ ও ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হ্যাঁ, রাসূলের সা. সুন্নাহতে এমন বস্তুর লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা অস্তিত্বহীন এবং বাস্তবে বিদ্যমান নয়। তবে উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ অস্তিত্বে থাকা কিংবা না থাকার সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং ঝুঁকিপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত, যা সাধারণত ডেলিভারী সম্ভবপর নয় চাই তা বাস্তবে বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। যেমন: পলায়নরত দাস, ছুটে যাওয়া উট ইত্যাদির লেনদেন নিষিদ্ধ, যদিও বাস্তবে এগুলো বিদ্যমান। যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ বিধান হচ্ছে বিক্রিত পণ্যের তাৎক্ষণিক হস্তান্তর, সুতরাং বিক্রেতা যদি তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে উক্ত লেনদেন অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। কারণ উক্ত চুক্তি তখন অনিশ্চয়তা, রিস্ক, জুয়া ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে।[২৮]

উল্লেখ্য যে, ইছতিসনা চুক্তির প্রকৃতি নিয়ে হানাফী মাযহাবে একাধিক মতামত রয়েছে; এটি কি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি না ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি বিনিময় কিংবা ইজারাদান চুক্তি। যদি এটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি হয় তাহলে বিক্রিত বস্তু হিসেবে কোনটি বিবেচিত হবে; নির্মিত পণ্য না নির্মাতার পরিশ্রম। কেউ কেউ মনে করেন, এটি হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি বিনিময়, যা সংশ্লিষ্ট বস্তুর নির্মাণকাজ শেষে হাতে-হাতে

---

২৮. ইবনে কাইয়্যেম আল-জাওযীয়্যাহ, *ই'লাম আল-মুয়াক্কী'য়ীন আন রাব্বিল 'আলামীন*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১, খ. ২, পৃ. ৭

বিনিময় করা হবে। এ ধরনের বিনিময় *বাই' আল-তা'আতী* (بيع التعاطي) হিসেবে পরিচিত। তাই সালামের বিপরীতে এখানে নির্মাতা ইচ্ছে করলে চুক্তি বাতিল করে কাজ বন্ধ করে দিতে পারবে এবং এক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করা যাবে না। এমনিভাবে ক্রেতা তথা অর্ডারকারীও ইচ্ছে করলে চুক্তি থেকে ফিরে আসতে এবং নির্মিত বস্তু প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। সুতরাং এ বিবেচনায় ইছতিসনা একটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য চুক্তি, যা যে কোন মুহূর্তে বাতিল করা যায়। অধিকাংশ হানাফী ফকীহ মনে করেন, ইছতিসনা একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। তবে এটি এমন চুক্তি যেখানে নির্মাণ কাজের শর্তারোপ করা হয় এবং নির্মাণ শেষে ক্রেতার পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান চালানোর সুযোগ থাকে। যদি নির্মিত বস্তু শর্ত মোতাবেক না হয়, তাহলে ক্রেতা পর্যবেক্ষণের সুযোগ (option of inspection) ব্যবহার করত চুক্তি বাতিল করতে এবং নির্মিত বস্তু গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবে। সুতরাং ইছতিসনা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি অন্যান্য সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি থেকে ভিন্ন। এছাড়া কোনো কোন হানাফী ফকীহ মনে করেন, ইছতিসনা হচ্ছে একটি নিছক ইজারা (শ্রম ভাড়া) চুক্তি।[২৯] আবার অনেকে মনে করেন, প্রাথমিকভাবে এটি ইজারা চুক্তি এবং সর্বশেষে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে পরিণত হয়।[৩০]

হানাফী মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য মাযহাবের মতে, পৃথকভাবে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ নয়; কারণ এখানে উপস্থিত ও বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেনদেন করা হয়, যা ইসলামী আইনে অবৈধ। এমনিভাবে এটি কোন শ্রমভাড়া চুক্তি নয়; কারণ এখানে কোন একজনকে ভাড়া করা হয় তার মালিকানাধীন সম্পদে কাজ করার জন্য এবং তা বৈধ নয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অপরজনকে বলে উক্ত স্থান থেকে তোমার খাবার-দাবার

---

২৯. ইছতিসনা চুক্তি এবং ইজারাহ তথা কোন কাজের জন্য কাউকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া নেয়ার চুক্তির (*ইজারাহ আলা আস্-সান'য়ি*) মাঝে কতিপয় মিল ও অমিল রয়েছে। উভয় চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট একটি কাজ সমাধা করে দেয়ার নিমিত্তে একজন লোককে ভাড়ায় খাটানো হয় কিংবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ দেয়া হয়। ইছতিসনা চুক্তিতে কোন কিছু নির্মাণকল্পে কারিগর কিংবা নির্মাতার সাথে চুক্তি সমাধা হয় এবং ইজারাহ চুক্তিতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়। উভয়ের মধ্যে অমিল হচ্ছে, ইজারাহ চুক্তি হয়ে থাকে কাজের উপর এবং অপরদিকে ইছতিসনা চুক্তি হয়ে থাকে নির্মিতব্য কোন বস্তুর উপর যা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত হয়ে থাকে। উপরন্তু ইছতিসনা চুক্তিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কারিগরকে সরবরাহ করতে হয় এবং অপরদিকে ইজারাহ চুক্তিতে তা নিয়োগকর্তাকে সরবরাহ করতে হয়, দেখুন: আল-মাউসূ'আহ আল-ফিক্‌হিয়্যাহ, কুয়েত: ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯২, খ. ৩, পৃ. ৩২৬

৩০. আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহে আল-হিদায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৩; ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক*, খ. ৬, পৃ. ২৮৪; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯৫; *আল-মাউসূ'আহ আল-ফিক্‌হিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ৩২৭

নিয়ে এসো কিংবা তোমার কাপড় লাল রঙে রঙিন করো ইত্যাদি অনুরোধ কিংবা নির্দেশ বৈধ ও গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এ সকল মাযহাবের মতামত অনুযায়ী ইছতিসনা চুক্তি যদি সালাম চুক্তির উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে সালামের যাবতীয় শর্ত প্রযোজ্য হবে, যেখানে উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে নির্মিতব্য বস্তুর পুরো মূল্য পরিশোধ করতে হবে।[৩১]

মালিকী মাযহাবের বক্তব্য অনুযায়ী সালামের উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হওয়া নির্মাণ চুক্তি তথা ইছতিসনা বৈধ।[৩২] উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হি.) কারখানায় নির্মিত বস্তুতে সালাম চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রসঙ্গে ইছতিসনার আলোচনা করেছেন এবং সেখানে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন উক্ত বিনিয়োগ কিংবা শুরুতে মূল্য পরিশোধ করা বৈধ। ইমাম মালিক বলেন:

> إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا، وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة، وليس من شيء بعينه يريه إياه يعمله منه، ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه، وقدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين ولم يضرب لرأس المال أجلا، فهذا السلف جائز، وهو لازم للذي عليه يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما وصفا.
>
> যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছু নির্মাণ করার জন্য অর্ডার করে, যেখানে দীর্ঘ দিনের অবকাশ দেয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, ধরণ, ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নির্মাতার দায়িত্বে তা ছেড়ে দেয়া হয়; যেখানে অর্ডারকারীর পক্ষ থেকে কোন নির্মাণ উপকরণ দেয়া হয় না কিংবা নির্মাতা হিসেবে নির্দিষ্ট কোন কারিগরের শর্তারোপ করা হয় না; এবং যেখানে চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধের কোন নির্ধারিত দীর্ঘ সময়সীমা থাকে না, বরং তা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে কিংবা দু'একদিন পরে পরিশোধ করা হয়; উক্ত বিনিময় কিংবা ঋণ চুক্তি বৈধ এবং যদি চুক্তির শর্তানুযায়ী কাঙ্খিত বস্তুর নির্মাণ সম্পন্ন হয় তখন অর্ডারকারী তথা ক্রেতা তা ক্রয় করতে বাধ্য।[৩৩]

এমনিভাবে শাফিয়ী মাযহাবের দৃষ্টিতে, যদিও নির্মিত বস্তু হস্তান্তর করার সময় অনির্ধারিত, তথাপিও 'সালাম হাল' তথা নগদ সালামের বৈধতার উপর ভিত্তি করে উক্ত নির্মাণ চুক্তিও বৈধ হবে। উল্লেখ্য যে, শাফিয়ী মাযহাবের মতামত অনুযায়ী নগদ সালাম বৈধ যেখানে চুক্তি হওয়ার প্রাক্কালেই চুক্তিকৃত তথা বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করা হয়।[৩৪]

---

৩১. ওয়াহবা মুস্তফা আয-যুহাইলী, "আক্দ আল-ইছতিসনা", *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২ (১৯৯২), পৃ. ৩১০; আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহে আল-হিদায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৪

৩২. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খারশী, *শরহে আল-খারশী আলা মুখতাসার খালীল*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭, খ. ৬, পৃ. ১০২

৩৩. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ আল-কুবরা*, খ. ৪, পৃ. ২২

৩৪. আয-যুহাইলী, "আক্দ আল-ইছতিসনা", পৃ. ৩১০; আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহে আল-হিদায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৪

সুতরাং সর্বসম্মত মতামত হচ্ছে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ এবং শরীয়াতসম্মত। তাই কেউ যদি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে সুনির্ধারিত কোন কিছু নির্মাণকল্পে নির্মাতা কিংবা নির্মাণ কোম্পানির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তা ইছতিসনা হিসেবে নামকরণ করা হউক বা না হউক, উক্ত চুক্তি বৈধ এবং ইসলামী আইনে অনুমোদিত।

ইসলামী আইনে ইছতিসনা চুক্তির নীতিমালা

ইসলামী আইনে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে, নিম্নে তা আলোচনা কর হলো:

এক: সমাজে প্রচলিত বস্তুতে ইছতিসনা চুক্তি সম্পাদন করা

সাধারণত যে সকল বস্তু নির্মাণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেখানে প্রচলিত নিয়মে নির্মাণ চুক্তি সম্পাদিত হয় সে সকল ক্ষেত্রে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ ও প্রযোজ্য, যেমন: লৌহ, ইস্পাত, শিসা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, এ সকল বস্তুতে নির্মাণ চুক্তি প্রচলিত হলেও ইছতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে এগুলো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যাতে সঠিকভাবে তা হস্তান্তর করা সম্ভবপর হয়। অপরদিকে যে সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে নির্মাণ চুক্তি সম্পাদিত হয় না সেগুলো সাধারণ বিধানের আওতাধীন হবে এবং সে সব ক্ষেত্রে সালাম চুক্তি প্রযোজ্য হবে।[৩৫] আল-কাসানী বলেন:

> أن يكون ما للناس فيه تعامل كالقلنسوة والخف والآنية ونحوها فلا يجوز فيما لا تعامل لهم فيه
>
> যে সকল বস্তুতে ইছতিসনার ব্যবহার মানব সমাজে প্রচলন রয়েছে ঐ সকল বস্তুতে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ, যেমন টুপি, মোজা, পাত্র ইত্যাদি। অপরদিকে সমাজে যে সকল বস্তুতে ইছতিসনার প্রচলন নেই সে সকল বস্তুতে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ হবে না।[৩৬]

মাজাল্লাহ'র ৩৮৯ নং ধারায় বলা হয়েছে:

> كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق، وأما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم، وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا
>
> সাধারণত যে সকল বস্তু নির্মাণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেখানে নির্মাণ চুক্তির সম্পাদন বহুলাংশে প্রচলিত, সেখানে ইছতিসনা চুক্তির সম্পাদন বৈধ। অপরদিকে

---

৩৫. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে,* খ. ৭, পৃ. ১১০; আলী ইবনে আবু বাক্র আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ মা'আ আল-বিনায়াহ,* বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ৮, পৃ. ৩৭৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ১৯৫

৩৬. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে,* খ. ৭, পৃ. ১১০

যে সকল বস্তুতে সাধারণত নির্মাণ চুক্তি সম্পাদিত হয় না, সেক্ষেত্রে যদি নির্মাণ কার্য সমাধা করার কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, তবে তা সালাম চুক্তিতে পরিণত হবে এবং সালামের যাবতীয় নীতিমালা সেখানে প্রযোজ্য হবে। যদি নির্মাণ কাজ শেষ করার কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা না হয়, তবে তাও ইছতিসনা চুক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।[৩৭]

দুই: ইছতিসনা পণ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে

যে সকল বস্তুতে ইছতিসনা চুক্তি সম্পাদিত হবে তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গুণাগুণ, ধরণ, শ্রেণি, পরিমাণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করত তা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সাধারণত ইছতিসনা চুক্তিতে নির্মাতার পক্ষ থেকে দুটি বিষয় দাবি করা হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে তার কাজ এবং অপরটি হচ্ছে নির্মিতব্য পণ্য। সুতরাং উভয়টিই সুনির্দিষ্ট হতে হবে, যাতে সঠিকভাবে তা হস্তান্তর করা সম্ভব হয়।

আল-কাসানী বলেন:

من شرائط جوازه بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه مبيع فلا بد وأن يكون معلوما، والعلم إنما يحصل بأشياء

ইছতিসনা চুক্তি বৈধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে ইছতিসনা পণ্যের শ্রেণি, প্রকার, ধরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা। যেহেতু এটি হচ্ছে বিক্রিত বস্তু সুতরাং তা অবশ্যই পরিচিত হতে হবে, আর মূলত এ সকল বর্ণনার মাধ্যমেই কোন বস্তু পরিচিত হয়ে থাকে।[৩৮]

মাজাল্লাহ'র ৩৯০ নং ধারায় বলা হয়েছে:

يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق للمطلوب

ইছতিসনা পণ্যের কাঙ্খিত এবং প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করে দেয়া আবশ্যক।[৩৯]

তিন: ইছতিসনা চুক্তির সময়সীমা সুনির্দিষ্ট হতে হবে

ইছতিসনা চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট বস্তু নির্মাণের সময়সীমা নির্দিষ্ট হতে হবে, চাই তা দীর্ঘ মেয়াদী কিংবা স্বল্প মেয়াদী হউক। তবে এক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের একাধিক মতামত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার (৮০-১৫০ হি.) মতে ইছতিসনা চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট পণ্য নির্মাণের কোন নির্ধারিত সময়সীমা থাকবে না। যদি এরূপ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তবে তা সালাম চুক্তিতে পরিণত হবে। এছাড়াও সময়সীমা নির্ধারণ, বিলম্বে হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, যা সালাম চুক্তিতে

---

৩৭. *আল-মাজ্জাল্লাহ*, পৃ. ৬৭

৩৮. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১০৯

৩৯. *আল-মাজ্জাল্লাহ*, পৃ. ৬৭

বিদ্যমান। যেহেতু ইছতিসনা চুক্তিতে ঋণের কোন সম্পৃক্ততা নেই, সুতরাং এখানে সময়সীমা নির্ধারণ করার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) ও মুহাম্মদ (১৩১-১৮৯ হি.) এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, সালামের ন্যায় ইছতিসনা চুক্তিতেও সংশ্লিষ্ট পণ্য নির্মাণ ও হস্তান্তরের সময়সীমা নির্ধারিত হতে হবে। যেহেতু সমাজে সময়সীমা নির্ধারণসহ ইছতিসনা চুক্তির প্রচলন রয়েছে, সুতরাং শুধুমাত্র সময়সীমা নির্ধারণের কারণে তা সালাম চুক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে না। উপরন্তু, বিলম্বে হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান যেমনিভাবে ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, তেমনিভাবে তা কাজ সমাধা করার জন্য তাগাদা দেয়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং এ সকল সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র সময়সীমা নির্ধারণ করার কারণে ইছতিসনা চুক্তি সালাম চুক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে না।[৪০] লেখকও মনে করেন, সালামের ন্যায় ইছতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট পণ্য নির্মাণ ও হস্তান্তরের সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তা চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমীর ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তেও ইছতিসনা চুক্তির জন্য সময়সীমা নির্ধারিত থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:

يشترط في عقد الاستصناع أن يحدد فيه الأجل

ইছতিসনা চুক্তির বৈধতা ও পালনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে নির্মিতব্য পণ্য নির্মাণ ও হস্তান্তরের সময়সীমা নির্ধারিত থাকা।[৪১]

চারঃ ইছতিসনা চুক্তি বাতিলযোগ্য নয় (irrevocable)

অন্যান্য সকল বিনিময় চুক্তি, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, লিজ, ইত্যাদির ন্যায় ইছতিসনা চুক্তিও বাতিলযোগ্য নয়। যখনি উভয় পক্ষের সম্মতিতে তাদের প্রস্তাবনা (offer) ও সম্মতিসহ (acceptance) চুক্তি সমাধা হয়ে যাবে, তখনি উভয়পক্ষ চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য থাকবে এবং কোন অবস্থাতেই চুক্তির নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করতে পারবে না। হ্যাঁ, তবে যদি ইছতিসনা পণ্য কাঙ্খিত ও চুক্তিকৃত মান ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্মিত না হয় সেক্ষেত্রে অর্ডারকারী তথা ক্রেতা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবে। এমতাবস্থায় ক্রেতা পর্যবেক্ষণের অধিকার (option of inspection) প্রয়োগ করত ইচ্ছে করলে নির্মিত পণ্য গ্রহণ করতে কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

---

৪০. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১১১; আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ মা'আ আল-বিনায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯৫; ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক*, খ. ৬, পৃ. ২৮৫

৪১. *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২(১৯৯২), পৃ. ৭৭৮

মাজাল্লাহ'র ৩৯২ নং ধারায় বলা হয়েছে:

> اذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا.
>
> ইছতিসনা চুক্তি সমাধা হওয়ার পরে কোন পক্ষের জন্য চুক্তি প্রত্যাখ্যান করা কিংবা চুক্তি থেকে ফিরে আসার অনুমতি নেই। তবে যদি নির্মিত পণ্য চুক্তিপত্রে উল্লেখিত কাঙ্খিত মানের না হয়, সেক্ষেত্রে অর্ডারকারী তথা ক্রেতার তা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে।[৪২]

উল্লেখ্য যে, ইছতিসনা চুক্তির প্রকৃতি নিয়ে হানাফী ফকীহগণের মধ্যে একাধিক মতামত রয়েছে। অধিকাংশ হানাফী ফকীহ মনে করেন, ইছতিসনা বাতিলযোগ্য (revocable) একটি চুক্তি এবং এ চুক্তি পালনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো বাধ্য নয়, চাই ইছতিসনা পণ্য চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্মিত হউক বা না হউক। সুতরাং ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা যে কোন সময় ইচ্ছে করলে চুক্তি থেকে সরে আসতে পারবে। তাদের যুক্তি হলো, যদি ইছতিসনা অবশ্য পালনীয় (irrevocable) চুক্তি হয়, তাহলে এতে উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্মাতা হয়তো এমন কিছু নির্মাণ করতে বাধ্য হবে যার উপযুক্ততা বা যোগ্যতা তার নেই। অপরদিকে ক্রেতাও হয়তো পর্যবেক্ষণ করা ব্যতিরেকে এমন কিছু ক্রয় করতে বাধ্য হবে, যা তার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয়।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফের মতামত হচ্ছে, ইছতিসনা চুক্তি বাতিলযোগ্য নয়; বরং এটি অবশ্য পালনীয় (irrevocable) একটি চুক্তি। যথাযথভাবে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই চুক্তির নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। তার যুক্তি হচ্ছে, যদি ইছতিসনা বাতিলযোগ্য (revocable) চুক্তি হয়, তাহলে এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি নির্মাতা চুক্তি থেকে সরে এসে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখে, তাহলে এতে ক্রেতা তার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপরদিকে ক্রেতা যদি চুক্তি থেকে ফিরে আসে তাহলে নির্মাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কারণ সে হয়তো ইতোমধ্যে নির্মাণকাজে প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগ করে ফেলছে। সুতরাং নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে গেলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৪৩]

ইমাম আবু ইউসুফের সাথে একাত্মতা পোষণ করত লেখকেরও মতামত হচ্ছে, অন্যান্য সকল বিনিময় চুক্তির ন্যায় ইছতিসনাও অবশ্য পালনীয় (irrevocable) একটি চুক্তি।

---

৪২. *আল-মাজাল্লাহ*, পৃ. ৬৭

৪৩. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১১০; আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ মা'আ আল-বিনায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৫; ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক*, খ. ৬, পৃ. ২৮৫; ইবনে হুমাম, *শরহে ফাতহুল ক্বাদীর*, খ. ৭, পৃ. ১০৯; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯৫

সঠিক নিয়মানুযায়ী চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সকল পক্ষই চুক্তির যাবতীয় শর্তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। তবে হ্যাঁ, যদি নির্মিত পণ্য চুক্তির শর্তানুযায়ী না হয় সেক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য তা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকবে।

বাহরাইনস্থ ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নকারী সংস্থা "একাউন্টিং এণ্ড অডিটিং অর্গানাইজেশান ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশানস" (AAOIFI) ইছতিসনা চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য অবশ্য পালনীয় (binding) হিসেবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। উক্ত সংস্থার ১১ নং স্টান্ডার্ডে বলা হয়েছে:

> A contract of Istisna is binding on the contracting parties, provided that certain conditions are fulfilled, which include specifications of the type, kind, and quality of the subject-matter to be produced.
>
> সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য ইছতিসনা চুক্তি অবশ্য পালনীয়, যদি চুক্তির যাবতীয় শর্তা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে যখন চুক্তিতে উল্লেখিত প্রকার, ধরণ, ও গুণাগুণ ইত্যাদির আলোকে ইছতিসনা পণ্য নির্মিত হয়ে থাকে।[৪৪]

ইসলামী ফিক্হ একাডেমীর ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তেও ইছতিসনা চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য অবশ্য পালনীয় (binding) বলে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:

> إن عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط
>
> প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক বিষয় ও শর্তাবলী পরিপূর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে ইছতিসনা চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য অবশ্য পালনীয় এবং বাধ্যতামূলক।[৪৫]

পাঁচ: ইছতিসনা পণ্য নির্মাণের উপায়-উপকরণ

ইছতিসনা পণ্য নির্মাণের উপায়-উপকরণ কারিগর তথা নির্মাতার পক্ষ থেকে সরবরাহ করতে হবে। যদি অর্ডারকারী তথা ক্রেতার পক্ষ থেকে উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হয়, তাহলে তা ইছতিসনা নয়; বরং শ্রমভাড়া (*ইজারাহ*) চুক্তিতে পরিণত হবে।[৪৬]

ছয়: ইছতিসনা পণ্যের মূল্য

ইছতিসনা পণ্যের মূল্য অবশ্যই পণ্যের ধরন, প্রকার, পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদির আলোকে সুনির্দিষ্ট হতে হবে। উল্লেখ্য যে ইছতিসনা পণ্যের মূল্য নগদ টাকা, তরল এসেট, স্থাবর সম্পত্তি, এসেটের ব্যবহার ইত্যাদির যে কোনটিই হতে পারে।[৪৭]

---

৪৪. একাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশান ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশান্স (AAOIFI), শরীয়া স্টান্ডার্ড নং ১১, 'ইছতিসনা এন্ড প্যারালেল ইছতিসনা', ২/২, বাহরাইন, ২০১০ ইং।

৪৫. *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২ (১৯৯২), পৃ. ৭৭৭

৪৬. ইনসেফ, *শরীয়া রুলস ইন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সেকশান্স*, কুয়ালালামপুর, ২০১১, পৃ. ২৪৪

৪৭. প্রাগুক্ত।

ইছতিসনা পণ্যের মূল্য সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পুরোটাই বাকিতে একসাথে কিংবা পূর্ব নির্ধারিত একাধিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যেতে পারে। ইসলামী ফিক্হ একাডেমীর ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে:

> يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة
>
> ইছতিসনা চুক্তিতে নির্মিতব্য পণ্যের চুক্তিকৃত মূল্য পুরোটাই সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকিতে একসাথে কিংবা পূর্ব নির্ধারিত একাধিক কিস্তিতে পরিশোধ করা বৈধ হবে।[৪৮]

ইছতিসনা চুক্তিতে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

যেহেতু ইছতিসনা ইসলামী আইনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী চুক্তি, তাই এখানে কিছু বিশেষ শর্ত প্রযোজ্য। নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো ইছতিসনা চুক্তিতে নিষিদ্ধ:

এক: ইছতিসনা চুক্তিতে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা, মাত্রাতিরিক্ত অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা (ambiguity/غرر) কিংবা অজ্ঞতা (ignorance/جهالة) ইত্যাদি থাকতে পারবে না। অতএব ইছতিসনা পণ্য এবং পণ্যের মূল্যসহ সংশ্লিষ্ট সবকিছু সকল দিক থেকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

দুই: ইছতিসনা চুক্তির প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট পণ্য বিদ্যমান কিংবা নির্মিত অবস্থায় থাকতে পারবে না।

তিন: ইছতিসনা পণ্যের চুক্তিকৃত মূল্যের কোন পরিবর্তন তথা কম-বেশি হতে পারবে না।

চার: ইছতিসনা পণ্য নির্মাণের উপায়-উপকরণ অর্ডারকারী তথা ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহ করা যাবে না।

পাঁচ: ইছতিসনা চুক্তিতে নির্মাতা কর্তৃক এ ধরনের কোন শর্তারোপ করা যাবে না যে, যদি ইছতিসনার ভিত্তিতে নির্মিতব্য পণ্যে কোন সমস্যা হয় তাহলে তার জন্য সে দায়ি থাকবে না।

ছয়: সমান্তরাল (parallel) ইছতিসনার ক্ষেত্রে ব্যাংক শুধুমাত্র ডেভেলপার এবং কাস্টমারের মাঝে তহবিল সরবরাহকারীর ভূমিকা অবলম্বন করতে পারবে না। তাই এ ক্ষেত্রে দু'টো চুক্তিই পৃথকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।[৪৯]

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইছতিসনা বিনিয়োগের খাতসমূহ

সমসাময়িক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইছতিসনা চুক্তির বহুবিধ ও ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিনিয়োগ থেকে শুরু করে বড় বড় প্রায় সকল প্রকল্পে ইছতিসনার মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। নিম্নে ইছতিসনা বিনিয়োগের নানাবিধ খাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

---

৪৮. *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২(১৯৯২), পৃ. ৭৭

৪৯. ইনসেফ, *শরীয়া রুলস ইন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সেকশান্স*, পৃ. ২৪৫-২৪৬

১. অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইছতিসনা বিনিয়োগ

সাধারণত অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমনঃ বহুতল দালান, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি নির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইছতিসনা চুক্তি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও উন্নত প্রযুক্তিগত শিল্প-কারখানা যেমন এয়ারক্রাফট নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, বড় বড় মেশিন ও যন্ত্রাংশ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প-কারখানায় ইছতিসনার মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়। জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও জনজীবন থেকে দুঃখ-কষ্ট লাঘবে এ সকল বিনিয়োগ অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।[৫০] ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ
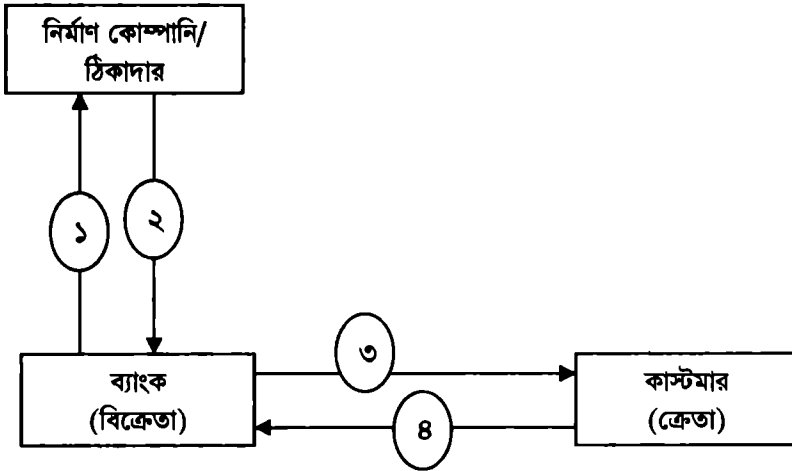
চিত্র ০২: ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া[৫১]

১. কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী ব্যাংক নির্মাণ কোম্পানী বা ঠিকাদারকে সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবে।
২. নির্মাণ কোম্পানি বা ঠিকাদার ব্যাংকের নিকট সংশ্লিষ্ট পণ্য ডেলিভারি তথা হস্তান্তর করবে।
৩. ব্যাংক উক্ত পণ্য কাস্টমারের নিকট হস্তান্তর করবে।
৪. কাস্টমার চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংককে উক্ত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে।

---

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

[৫১] মাশহুরী মুস্তফা, *স্ট্রাকচারিং ইসলামিক ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটিস*, কুয়ালালামপুরঃ আইবিএফআইএম, ২০১৪, পৃ. ২৭

২. নির্মাণাধীন আবাসন (property) প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগ

পরিকল্পনাধীন কিংবা নির্মাণাধীন কোন আবাসন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দেয়ার নিমিত্তে ইছতিসনা বিনিয়োগ একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ইছতিসনা বিনিয়োগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যেখানে ক্রেতা প্রদত্ত গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিক্রেতা তথা ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পণ্য নির্মাণ করার কিংবা যোগান দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে থাকে এবং চুক্তিকৃত মূল্যে পরবর্তীতে তা অর্ডারকারী তথা ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য যেমনিভাবে চুক্তি হওয়ার প্রাক্কালে পরিশোধ করা যেতে পারে, তেমনিভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকিতে একসাথে কিংবা একাধিক কিস্তিতেও পরিশোধ করা যেতে পারে। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে আবাসন কিংবা স্থাবর সম্পত্তিতে ইছতিসনা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক নির্মাণ কোম্পানির সাথে দ্বিতীয় একটি ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে, যা সমান্তরাল (parallel) ইছতিসনা হিসেবে পরিচিত। সুতরাং এখানে মূলত দু'টি ইছতিসনা চুক্তি হয়ে থাকে, প্রথমটি ব্যাংক কাস্টমারের সাথে এবং দ্বিতীয়টি ব্যাংক নির্মাণ কোম্পানির সাথে সম্পন্ন করে থাকে।[৫২] নির্মাণাধীন আবাসন কিংবা প্রোপার্টি প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলো:
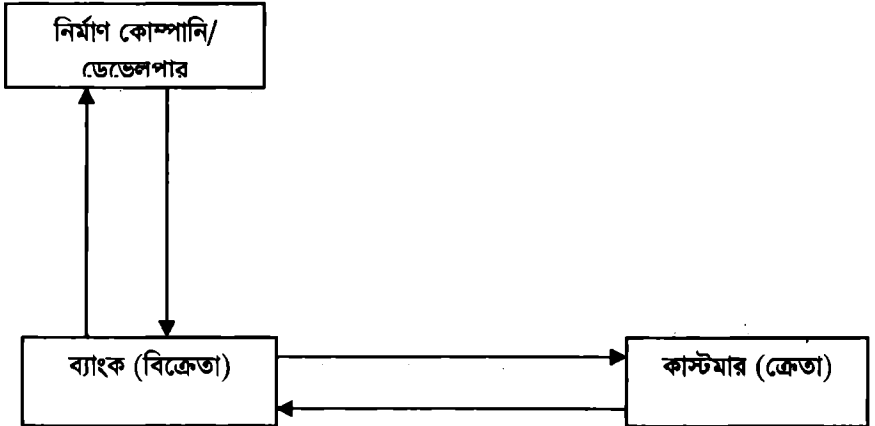
চিত্র ০৩: নির্মাণাধীন আবাসন প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া[৫৩]

১. প্রথম ইছতিসনা চুক্তি

ক. গ্রাহক ইছতিসনার জন্য কাঙ্খিত সম্পদ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানের নিমিত্তে ব্যাংকের শরণাপন্ন হবেন এবং সংশ্লিষ্ট

---

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

এসেটের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারিত তথ্যাদি ব্যাংকের নিকট পেশ করবেন।

খ. বাস্তবিক ক্ষেত্রে কখনো ব্যাংক কাস্টমারের সাথে একটি ওয়াকালাহ তথা এজেন্সী চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে, যেখানে ব্যাংক কাস্টমারকে তার এজেন্ট মনোনীত করে থাকে যাতে কাস্টমার ব্যাংকের পক্ষ থেকে ডেভেলপারকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করতে এবং পরবর্তীতে নির্মিত বাড়ীর ডেলিভারী নিতে সক্ষম হয়।

গ. ব্যাংক কাস্টমারের সাথে প্রথম ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করবে যেখানে ব্যাংক কাস্টমারের প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত বাড়ী যোগান দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

ঘ. এ পর্যায়ে ব্যাংক কাস্টমার থেকে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে যেখানে বাড়ী নির্মিত হওয়ার পর কাস্টমার তা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিবে, যদি তা কাস্টমার প্রদত্ত শর্তাবলি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্মিত হয়ে থাকে।

২. দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি

ক. এ পর্যায়ে ব্যাংক ডেভেলপারের সাথে দ্বিতীয় একটি ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করবে, যে চুক্তি অনুযায়ী ডেভেলপার কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী বাড়ী নির্মাণ করবে। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি অবশ্যই প্রথম ইছতিসনা চুক্তি থেকে পৃথক, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হতে হবে।

খ. ডেভেলপার পরিপূর্ণ নির্মিত বাড়ী ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবে।

গ. ব্যাংক তখন ডেভেলপারকে চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধ করবে।

৩. এ পর্যায়ে ব্যাংক প্রথম ইছতিসনা চুক্তি অনুযায়ী কাস্টমারকে পরিপূর্ণ নির্মিত বাড়ী সরবরাহ করবে।

৪. কাস্টমার তখন চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংককে বাড়ীর মূল্য পরিশোধ করবে এবং তা নগদ কিংবা বাকি, একসাথে বা একাধিক কিস্তিতেও হতে পারে।[৫৪]

৩. বড় বড় যন্ত্রাংশ (equipment) যোগানে ইছতিসনা বিনিয়োগ

বড় বড় মিল-কারখানার হেভি ও বড় যন্ত্রাংশ সংগ্রহের নিমিত্তে ইছতিসনা বিনিয়োগের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দিয়ে থাকে। এটি মূলত একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যেখানে বিক্রেতা তথা ব্যাংক অর্ডারকারী প্রদত্ত শর্তাবলির আলোকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সরবরাহ করার দায়িত্ব নিয়ে থাকে

---

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

এবং পরবর্তীতে তা চুক্তিকৃত মূল্যে ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে থাকে। বিক্রয় মূল্য যেমনিভাবে নগদ পরিশোধ করা যেতে পারে তেমনিভাবে বাকিতে একসাথে কিংবা একাধিক কিস্তিতেও পরিশোধ করা যেতে পারে। তবে উল্লেখ্য যে বাস্তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ডিলার বা যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানীর সাথে দ্বিতীয় একটি ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে যা সমান্তরাল (parallel) ইছতিসনা হিসেবে পরিচিত। তাই এখানে মূলত দু'টি ইছতিসনা চুক্তি হয়ে থাকে, প্রথমটি ব্যাংক কাস্টমারের সাথে এবং দ্বিতীয়টি ব্যাংক ডিলার বা যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানির সাথে সম্পন্ন করে থাকে।[৫৫] বড় বড় যন্ত্রাংশ যোগানে ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলো:
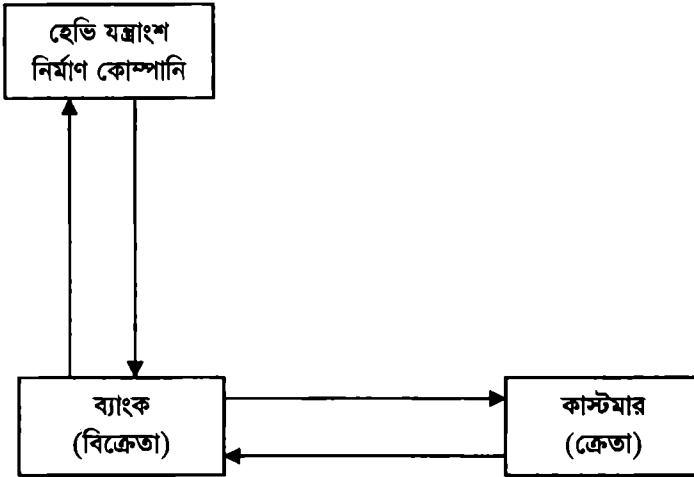
চিত্র ০৪: বড় বড় যন্ত্রাংশ যোগানে ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া[৫৬]

১. প্রথম ইছতিসনা চুক্তি

ক. কাস্টমার ইসলামী ব্যাংকের নিকট কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করত যন্ত্রাংশ ক্রয় করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তহবিল যোগান দেয়ার জন্য আবেদন করবে।

খ. বাস্তবিক ক্ষেত্রে কখনো ব্যাংক কাস্টমারের সাথে একটি ওয়াকালাহ তথা এজেন্সি চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে যেখানে ব্যাংক কাস্টমারকে তার

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

এজেন্ট মনোনীত করে থাকে, যাতে কাস্টমার ব্যাংকের পক্ষ থেকে যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করতে এবং পরবর্তীতে যন্ত্রাংশের ডেলিভারী নিতে সক্ষম হয়।

গ. ব্যাংক কাস্টমারের সাথে প্রথম ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করে, যেখানে ব্যাংক কাস্টমারকে তার প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত যন্ত্রাংশ যোগান দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ঘ. এ পর্যায়ে ব্যাংক কাস্টমার থেকে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে যেখানে পরিপূর্ণ নির্মিত হওয়ার পর কিংবা সংগ্রহ করার পর কাস্টমার যন্ত্রাংশ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিবে, যদি তা তার প্রদত্ত শর্তাবলি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্মিত কিংবা সংগৃহীত হয়ে থাকে।

২. দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি

ক. এ পর্যায়ে ব্যাংক যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানির সাথে দ্বিতীয় একটি ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করবে, যে চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রাংশ নির্মাণ করবে। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি অবশ্যই প্রথম ইছতিসনা চুক্তি থেকে পৃথক, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হবে।

খ. যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানি নির্মিত সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবে।

গ. ব্যাংক তখন নির্মাণ কোম্পানিকে চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধ করবে।

৩. এ পর্যায়ে ব্যাংক প্রথম ইছতিসনা চুক্তি অনুযায়ী কাস্টমারকে নির্মিত কিংবা সংগৃহীত যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে।

৪. কাস্টমার তখন চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংককে যন্ত্রাংশের মূল্য পরিশোধ করবে। উক্ত মূল্য নগদ কিংবা বাকি, একসাথে বা একাধিক কিস্তিতে হতে পারে।[৫৭]

৪ সমান্তরাল (parallel) ইছতিসনা চুক্তি

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, ইছতিসনা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমান্তরাল ইছতিসনা চুক্তি একটি সুপরিচিত ও বহুল প্রচলিত নাম। এ চুক্তির ব্যবস্থাপনায় দু'টি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রথম ইছতিসনা চুক্তি বিক্রেতা হিসেবে ব্যাংক এবং ক্রেতা হিসেবে কাস্টমারের মাঝে হয়ে থাকে। উক্ত চুক্তিতে ব্যাংক কাস্টমারকে তার প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত ইছতিসনা পণ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। দ্বিতীয় চুক্তি ক্রেতা হিসেবে ব্যাংক এবং

---

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

সরবরাহকারী হিসেবে নির্মাণ কোম্পানির সাথে হয়ে থাকে। এ চুক্তিতে ব্যাংক কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী নির্মাণ কোম্পানির সাথে পণ্য নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে। দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি প্রথম চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, অর্থাৎ: প্রথম চুক্তির দায়ভার কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় চুক্তির উপর বর্তাবে না। সুতরাং দ্বিতীয় চুক্তির নির্মাণ কোম্পানি কোন অবস্থাতেই প্রথম চুক্তির কাস্টমারের নিকট কোন কিছুতে দায়বদ্ধ থাকবে না। সকল পক্ষই শুধুমাত্র তার সংশ্লিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ থাকবে।[৫৮] সমসাময়িক বিশ্বের মুসলিম স্কলার ও আইনবিদগণ এ সমান্তরাল চুক্তির বৈধতা দিয়েছেন। একাউন্টিং এণ্ড অডিটিং অর্গানাইজেশান ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশানস (AAOIFI) সমান্তরাল ইছতিসনার চুক্তির বৈধতা দিয়েছে। উক্ত সংস্থার ১১ নং স্টাণ্ডার্ডে বলা হয়েছে:

> It is permissible for the institution to buy items on the basis of a clear and unambiguous specification and to pay, with the aim of providing liquidity to the manufacturer, the price in cash when the contract is concluded. Subsequently, the institution may enter into a contract with another party in order to sell, in the capacity of manufacturer or supplier, items whose specification conforms to the wishes of that other party, on the basis of parallel *istisna*, and fulfill its contractual obligation accordingly. This is permissible on condition that the delivery date stipulated in the parallel contract must not precede that stipulated in the original purchase contract, and moreover, the two contracts should remain separate from each other.
>
> ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের আলোকে নির্মাণ কোম্পানি থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করা কিংবা চুক্তি হওয়ার পরে তাকে প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দেয়া বৈধ। এমনিভাবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইচ্ছে করলে সমান্তরাল ইছতিসনার ভিত্তিতে তৃতীয় এক পক্ষের সাথে অপর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে যে সংশ্লিষ্ট পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী। এ ধরনের সমান্তরাল চুক্তি বৈধ, তবে শর্ত হচ্ছে দ্বিতীয় চুক্তিতে পণ্য ডেলিভারীর তারিখ অবশ্যই প্রথম চুক্তির ডেলিভারীর তারিখের পূর্বে হতে পারবে না। উপরন্তু উভয় চুক্তি পারস্পরিকভাবে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও পৃথক হতে হবে।[৫৯]

---

৫৮. ইনসেফ, *শরীয়া রুলস ইন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সেকশানস*, পৃ. ২৪৬

৫৯. AAOIFI, শরীয়াহ স্টান্ডার্ড নং ১১, 'ইছতিসনা এন্ড প্যারালেল ইছতিসনা', ৭/১

ইছতিসনা সুকূক: বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং এ ইছতিসনা সুকূক একটি অতি পরিচিত নাম। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত (underlying) চুক্তি হিসেবে ইছতিসনার প্রয়োগ করত ইসলামিক বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। সাধারণত বিশাল অংকের বড় বড় প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য ইছতিসনা সুকূক ইস্যু করা হয়ে থাকে। ইছতিসনা সুকূক দু'ধরনের হতে পারে। এক প্রকার যা ইছতিসনার মাধ্যমে নির্মিতব্য পণ্যের বিক্রয় মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দ্বিতীয় প্রকার যা ইছতিসনা এসেটের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং যে প্রকার সুকূক ইছতিসনা নির্মিতব্য এসেটের বিক্রয় মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে তা ঋণের উপর ভিত্তি করে ইস্যুকৃত (debt-based) সুকূক হিসেবে পরিগণিত হবে।[৬০] যার ফলশ্রুতিতে নির্মাণকালীন সময়ে তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট উক্ত সুকূক ডিসকাউন্ট মূল্যে বিক্রয় করা বৈধ হবে না।

ইছতিসনা সুকূকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ইছতিসনা সুকূক নির্মিতব্য সংশ্লিষ্ট পণ্য বা এসেটে কিংবা এসেটের বিক্রয় মূল্যে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে।
- সুকূকের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল সংশ্লিষ্ট পণ্য বা এসেটের নির্মাণকাজে ব্যয় করা হয়।
- ইছতিসনা সুকূকের বিনিয়োগকারীগণ সকল মূলধন একসাথে নগদ বিনিয়োগ করতে বাধ্য নয়; বরং নির্মাণকাজের বিভিন্ন ধাপের সাথে সঙ্গতি রেখে ক্রমান্বয়ে একাধিক কিস্তিতে বিনিয়োগ করতে পারবে।
- নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সুকূকের বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট এসেটের মালিকানা লাভ করবে এবং পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ তা ডেভেলপার কিংবা কন্ট্রাকটারের নিকট হস্তান্তর করবে। অবশ্যই ইচ্ছে করলে বিনিয়োগকারীগণ পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী ডেভেলপারের নিকট সংশ্লিষ্ট এসেট লীজও দিতে পারবে।
- যদি সংশ্লিষ্ট এসেটের নির্মাণকালীন সময়ে ইছতিসনা সূকুক সেকেণ্ডারী মার্কেটে লিস্টভুক্ত হয় তাহলে তা শুধু লিখিত মূল্যেই লেনদেন করা যাবে। যেহেতু সংশ্লিষ্ট এসেট এখনো নির্মাণাধীন তাই এ পর্যায়ে ইছতিসনা সুকূক ডিসকাউন্ট মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।[৬১]

---

৬০. সিকিউরিটিজ কমিশন মালয়েশিয়া, *ইসলামিক সিকিউরিটিজ (সুকূক) মার্কেট*, মালয়েশিয়া: লেক্সিস নেক্সিজ, ২০০৯, পৃ. ৬০

৬১. ওয়ান আবদুর রহীম কামিল, *আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং সুকূক*, কুয়ালালামপুর: আইবিএফআইএম, ২০১৪, পৃ. ২৪

ইছতিসনা সুকূকের কাঠামো নিম্নে দেখানো হলো:
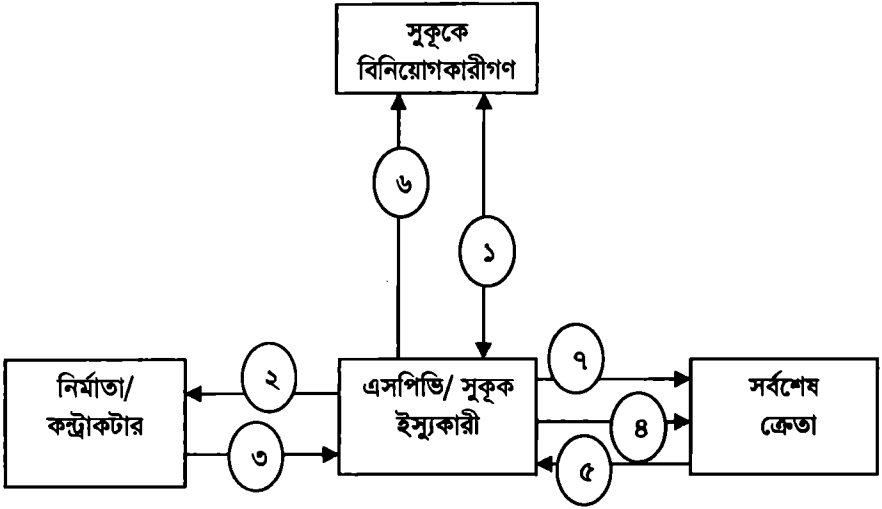
চিত্র ০৫: ইছতিসনা সুকূকের স্ট্রাকচার[৬২]

ইছতিসনা সুকূক ইস্যু করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

১. সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করার লক্ষ্যে স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (এসপিভি) তথা সুকূক ইস্যু করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারীদের জন্য সুকূক ইস্যু করবে। উল্লেখ্য যে, তহবিল হস্তগত হওয়ার পরই এসপিভি সুকূক ইস্যু করবে।

২. বিনিয়োগকারীদের থেকে সংগৃহীত তহবিল এসপিভি কন্ট্রাকটার কিংবা নির্মাণ কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করবে।

৩. সংশ্লিষ্ট এসেটের মালিকানা এসপিভির নিকট হস্তান্তর করা হবে।

৪. এসপিভি সংশ্লিষ্ট এসেট কাস্টমারের নিকট বিক্রয় করত এসেটের মালিকানা তার নিকট হস্তান্তর করবে।

৫. কাস্টমার চুক্তি অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে এসেটের মূল্য পরিশোধ করবে।

৬. কাস্টমার থেকে প্রাপ্ত মূল্য এসপিভি বিনিয়োগকারীদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করবে।

৭. সর্বশেষে নির্মাণ কাজ শেষে এসপিভি সংশ্লিষ্ট এসেট কাস্টমারের নিকট হস্তান্তর করবে।[৬৩]

---

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

ইছতিসনা সুকূক এখন শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়; বরং ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক একটি বিষয়। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্থানে পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের নিমিত্তে একাধিক ইছতিসনা সুকূক ইস্যু করা হয়েছে। যেমন: ২০০১ ইং সালে ৭৮০ মিলিয়ন রিঙ্গিত মূল্যের পারি পাওয়ার ইছতিসনা সুকূক, ২০০৩ সালে প্রায় ৬ বিলিয়ন রিঙ্গিত মূল্যের এসকেএস পাওয়ার ইছতিসনা মিডিয়াম টার্ম নোটস, ২০০৫ সালের মে মাসে যিমা এনার্জি ভেনছারস ইছতিসনা মিডিয়াম টার্ম নোটস, ২০০৫ সালে অগাস্ট মাসে ৫০০ মিলিয়ন রিঙ্গিত মূল্যের বায়ু পাদু ইছতিসনা বণ্ডস, ২০০৭ সালে প্রায় ২ বিলিয়ন রিঙ্গিত মূল্যের লেক্সাস ইছতিসনা সুকূক, ইত্যাদি ইছতিসনা সুকূকের কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রায়োগিক উদাহরণ।[৬৪]

উপসংহার

কোন কিছু নির্মাণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কারিগর কিংবা নির্মাতার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নাম হচ্ছে ইছতিসনা চুক্তি। ইছতিসনা চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট পণ্য অবশ্যই বাস্তবে বিদ্যমান নয় এমন হতে হবে। যদিও ইসলামী আইনে অনুপস্থিত কিংবা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেনদেন নিষিদ্ধ; তথাপিও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং জনজীবন থেকে দুর্ভোগ দূর করার লক্ষ্যেই ব্যতিক্রম হিসেবে ইসলামী আইনে ইছতিসনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। রাসূল সা. নিজেও এ চুক্তি করেছেন এবং অনুমোদন দিয়েছেন। শুধুমাত্র হানাফী মাযহাব প্রত্যক্ষভাবে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চুক্তি হিসেবে এর বৈধতা দিয়েছে। অন্যান্য সকল মাযহাব সালাম চুক্তির প্রাসঙ্গিক তথা শিল্প পণ্যে সালামের প্রয়োগ হিসেবে পরোক্ষভাবে ইছতিসনা চুক্তির বৈধতা দিয়েছে।

ইছতিসনা চুক্তির বৈধতার ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত প্রযোজ্য, যেমন: যে সকল পণ্যে ইছতিসনা চুক্তি সমাজ অনুমোদন করে শুধুমাত্র সে সকল পণ্যে ইছতিসনা চুক্তি করা, ইছতিসনা পণ্য এবং তার মূল্য শ্রেণি, প্রকার, ধরন, গুণাগুণ, পরিমাণ ইত্যাদি বর্ণনা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত হওয়া, চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর চুক্তিকৃত মূল্যের কোন কম-বেশি না হওয়া, ইছতিসনা পণ্য নির্মাণের উপকরণ নির্মাতা কর্তৃক সরবরাহ করা এবং অর্ডারকারী তথা ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহ না করা ইত্যাদি। আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং এ বিভিন্নভাবে ইছতিসনা চুক্তির প্রয়োগ হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, হাসপাতাল, বন্দর, পাওয়ার প্লান্ট, মহাসড়ক এবং জাহাজ নির্মাণসহ বড় বড় সকল প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তারল্য সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও ইছতিসনা সুকূক ইস্যু করার মাধ্যমে বড় বড় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

---

৬৪. *ইসলামিক সিকিউরিটিজ (সুকূক) মার্কেট*, পৃ. ৬১-৬৪

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ: ১২ সংখ্যা: ৪৫
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অগ্রগতি: বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

মো: তৌহিদুল ইসলাম*

Advancement in Islamic Finance: Global and Bangladesh Perspectives

ABSTRACT

Islamic Finance constitutes less than 2% of the entire global financial industry. Inspite of this fact, Islamic finance recently got tremendous popularity with 20% growth. In the last five years, annual average growth was 17% while Sharīʻah based asset doubled. By the end of 2014, this asset accounted for 2.1 trillion dollar whereby asset of Islamic banking was 78%, sukūk was 17%, Islamic fund was 4%, and Takāful was 1%. At the end of 2014, global deposit rose to 18.9% while Islamic finance grew by 21.7%. At present in Bangladesh 8 full-fledged Islamic banks, 19 branches of 9 conventional banks, and 25 banking windows of 07 conventional commercial banks are operating Islamic banking. By the end of 2014 in Bangladesh Islamic Banking accounted for 18% of deposits, 21% of investments , 17% of assets, 15% of equity, 28% of remittance, 21% of imports and 21% of exports. Classified investments of Islamic banking sector was 4.2% while classified investments of conventional banks accounted for 8.9%. In this analytical and descriptive paper data and information were collected from international economic reports, international standardizing institutions' report, various organizations' annual reports, central bank and other reliable sources. This paper presents advancement, present conditions, evaluation, analysis, strength and challenges of Islamic finance in the world and Bangladesh. Finally this paper provides recommendations for the expansion of Islamic banking in Bangladesh.

Keywords: Islamic banking and finance; Bangladesh; *sukūk*; Islamic fund; *Takāful.*

---

* প্রিন্সিপাল অফিসার, নিউ মার্কেট শাখা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।

সারসংক্ষেপ

বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতির অংশ ২% এর কম হলেও সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি গড়ে ২০% করে প্রবৃদ্ধি নিয়ে ইসলামী অর্থায়ন বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিগত পাঁচ বছরে শরীআহ্‌ভিত্তিক সম্পত্তি দ্বিগুণ হবার সাথে সাথে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭%। ২০১৪ সালের শেষে এই সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.১ ট্রিলিয়ন ডলার যার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ ৭৮%, সুকূক ১৭%, ইসলামী ফান্ড ৪% এবং তাকাফুল ১%। ২০১৪ সালের শেষে বৈশ্বিক ডিপোজিটের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮.৯%, এর বিপরীতে ইসলামী অর্থায়নের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২১.৭%। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮টি পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যাংক, ৯টি প্রচলিত কনভেনশনাল ব্যাংকের ১৯টি ব্যাংকিং শাখা এবং ৭টি প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২৫টি ব্যাংকিং উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং করছে। ২০১৪ সালের শেষে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর অংশ ছিল আমানত ১৮%, বিনিয়োগ ২১%, সম্পদ ১৭%, ইক্যুইটি ১৫%, রেমিটেন্স ২৮%, আমদানি ২১%, রপ্তানি ২১%। শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ ছিল ইসলামী ব্যাংকিং এ ৪.২% যেখানে সকল ব্যাংক এর গড় শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ ছিল ৮.৯%। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধটি প্রণয়নে অর্থনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক রিপোর্ট, মানদণ্ড প্রণয়নকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন, বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উৎস থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিশ্বে ও বাংলাদেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থার অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ন, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও গবেষণার নতুন দ্বার উন্মোচন, বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোকপাত এবং সর্বশেষে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রসারে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

মূলশব্দ: ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স; বাংলাদেশ; সুকূক; ইসলামী ফান্ড; তাকাফুল;

১. ভূমিকা

ইসলাম এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা উপস্থাপন করে, যা বিদ্যমান অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। এর উৎস হচ্ছে "শরী'আহ্", যার ভিত্তিতে এ ব্যবস্থার বিশ্বজনীন লক্ষ্য ও কৌশলের উদ্ভব হয়েছে[১]। মুদ্রা আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকেই অর্থব্যবস্থার আবির্ভাব। প্রাচীনকালে মানুষ শষ্যদানা, গবাদি পশু, স্বর্ণ ইত্যাদি বিনিময়ের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতো। মুদারাবার প্রচলন আল্লাহর রাসূল স.-এর সময়েও ছিল।[২] চৌদ্দতম শতাব্দিতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকের আবির্ভাব হয়। কিন্তু

---

১. শরী'আর মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্। ইজমা এবং কিয়াসও শরী'আর উৎস। শরী'আর মূল উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান সন্ততি ও সম্পদের সংরক্ষণ করা।

২. রাসূল সা. হযরত খাদিজা রা.-এর সঙ্গে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসায় করেছেন। সূত্র: Bank Negara Malayesia, *Shariah Standard on Mudaraba*, http://www.bnm.gov.my/guidelines/05_shariah/shariah_std_mudarabah.pdf

এর বহু পরে বিগত শতাব্দির চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে চিন্তা ও গবেষণা জোরদার হয়। ষাটের দশকে মিসরে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়। ১৯৬৯ সালে ওআইসি এবং ১৯৭৫ সালে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরে ইসলামী অর্থনীতির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।[৩]

২০১৪ সালের শেষে ইসলামী অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ দুই ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, যা আগামী পাঁচ বছরান্তে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনীতির অংশ পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ও চীনে সম্প্রসারিত হলেও এর মূল অংশ এখনো মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত। বাংলাদেশে বর্তমান ইসলামী অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ এক পঞ্চমাংশ ছাড়িয়েছে, যা বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনীতির ১.৩৪% এবং গড় প্রবৃদ্ধি ২০%। সম্পদমূল্যের দিক থেকে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থান দশম। পৃথিবীজুড়ে প্রায় ৪০ মিলিয়ন গ্রাহকের মধ্যে ১৩ মিলিয়ন বা প্রায় ৩৪% গ্রাহক এককভাবে বাংলাদেশের। বর্তমানে আমানত, বিনিয়োগ, বৈদেশিক রেমিটেন্স, আমদানি, রপ্তানি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, দারিদ্র্য বিমোচন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মুনাফাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।[৪]

বিগত দুই দশকে অর্থনীতিতে নতুন শক্তির আবির্ভাব, বিশ্ব রাজনীতির নতুন প্রেক্ষাপট, যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় হামলা, অর্থনৈতিক অবরোধ, অর্থনৈতিক মন্দা, আরব বসন্ত, সামষ্টিক অর্থনীতির পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বিশ্ব অর্থব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা পরবর্তী বহু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর প্রচলিত আর্থিক অবস্থার স্থিতিশীলতা ও সুস্থতার সঙ্গে আরো বহু বিষয়কে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ফলে একটি অধিকতর টেকসই সমাধান খুঁজে পেতে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাঠামোর যৌক্তিকতা নিয়ে নতুন করে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। উল্লিখিত ঘটনা ও বিষয়ের সামগ্রিক প্রভাব সত্ত্বেও ইসলামী অর্থনীতির ইতিবাচক অগ্রগতি বিশ্ব অর্থনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।

---

৩. Mumtaz Hussain, Aghar Shamoradi and Rima Turk, *An Overview of Islamic Finance,* IMF Working Paper: WP/15/120 by 2015. সূত্রঃ https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15120.pdf

৪. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014*, Issue: June 2015. Statistic Department,

২. বৈশ্বিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার অগ্রগতি : ইতিহাসের পাতা থেকে

ইসলামী ব্যাংকিং এর ইতিহাসকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে এটি কেবল চিন্তা ও তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় ভাগে ব্যক্তি/বেসরকারী পর্যায়ে আবার কোথাও সরকারীভাবে আইনের মাধ্যমে বাস্তব রূপ পায়।[৫] ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মালয়েশিয়ায় এবং ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে পাকিস্তানে ক্ষুদ্রাকারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং চালু হয়। এরপর ১৯৬২ সালে প্রথম ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে "মুসলিম পিলগ্রিম সেভিংস কর্পোরেশন" নামে সুদমুক্ত একটি সংস্থা মালয়েশিয়ায় যাত্রা শুরু করে।[৬] আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং-এর আবির্ভাব ঘটে ১৯৬৩ সালে। মিসরের ডক্টর আহমদ আল নাজ্জার মিটগামারে এটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা সঞ্চয় ব্যাংক নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭১ সালে নাসের সোস্যাল ব্যাংক নামে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রকাশ্যে যাত্রা শুরু করে। এরপর ১৯৭৩ সালে ফিলিপাইনে আমানাহ্ ব্যাংক (পিএবি) যাত্রা শুরু করে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) এর উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে আন্তঃসরকার ইসলামী ব্যাংকহিসেবে ইসলামী ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭] এরপর মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো এই ধারণা লুফে নেয়।[৮] ১৯৭৫ দুবাই ইসলামী ব্যাংক, ১৯৭৭ সালে ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান এবং ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব ইজিপ্ট, ১৯৭৮ সালে লুক্সেমবার্গে (পরবর্তীতে এর নাম করা হয় ইসলামিক ফিন্যান্স হাউজ)[৯] এর কিছু দিন পরে ডেনমার্কে ইসলামিক ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান তার সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামিকরণের উদ্যোগ নেয়। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই বছরে মালয়েশিয়া বৃহৎ পরিসরে ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইরান পুরো ব্যাংকিং সিস্টেম ইসলামিকরণ করার উদ্যোগ নেয়।[১০]

---

৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৬২

৬. Islamic Finance-A History, Financial Services Review, August 2008

৭. ৫৭ টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে ওআইসি গঠিত। এই সদস্য দেশগুলো তাদের জনগণসহ বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত এবং অগ্রগতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিজেদের সম্পদ একত্রিত করা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

৮. মোহাম্মদ আরিফ, "ইসলামিক ব্যাংকিং", *এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক লিটারেচার*, খ. ২, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ৪৬-৬২

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত

১৯৯১ সালে AAOIFI[১১] এবং ২০০২ সালে IFSB[১২] আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ২০০৪ সালে ইউরোপে জার্মানীর স্যাক্সোনি আনহল্ট রাজ্য প্রথমবারের মত ইসলামী বন্ড ইস্যু করে, যা মূলত সুকূক।[১৩] এর স্বীকৃতি হিসেবে গ্লোবাল ফিন্যান্স ম্যাগাজিন চালু করে ওয়ার্ল্ড বেস্ট ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এ্যাওয়ার্ড। কানেকটিকাট রাজ্যের শরীআহ্ ক্যাপিটালকে যুক্তরাষ্ট্রের সেরা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে গ্লোবাল ফিন্যান্স।[১৪]

৩. বৈশ্বিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাম্প্রতিক অগ্রগতি

২০১১ সালে থমসন রয়টার্স কর্তৃক বিশ্বের প্রথম ইসলামী আন্ত:ব্যাংক রেট চালু হয়েছে। একই সালে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক বেঞ্চমার্ক রেট (আইআইবিআর) উদ্বোধন হয়েছে। একই সময়ে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, এসইএসআরআইসি[১৫], এএওআইএফআই[১৬] ও বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাংকগুলোর সমন্বয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠিত হয়।[১৭] ২০১৩ সালের আগস্টে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া শরীআহ্ভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান চালুর অনুমতি দিয়েছে। ২০১২ সালে ডেভলপমেন্ট ব্যাংক অব কাজাকিস্তান সুকূক ইস্যুর অনুমতি দিয়েছে।[১৮] বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইন প্রণয়ন, ইসলামী বিনিয়োগ বন্ড ইস্যু এবং তারল্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে আন্ত:ব্যাংক মানি মার্কেট চালু করেছে। শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে হাটন ব্যাংককে অনুমোদন দিয়েছে। ইসলামী ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস বোর্ড ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে বৈশ্বিক (বিশেষ করে ৭টি

---

১১. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions যা ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ বাহরাইনে নিবন্ধিত হয়।

১২. International Financial Services Board যা ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে যাত্রা শুরু করে।

১৩. "Government Islamic bonds", রয়টার্স নিউজ, ইউকে, ২৩ এপ্রিল ২০০৭

১৪. Hussain, Shamoradi and Turk, An Overview of Islamic Finance.

১৫. Statistical Economic & Social Research & Training Centre for Islamic Countries ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রধান কার্যালয় তুরস্কের ইস্তাম্বুলে।

১৬. AAOIFI: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. পূর্বোক্ত।

১৭. ওআইসি দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন-ওআইসি আউটলুক সিরিজ, মে ২০১২। সূত্রঃ www.sesrtcic.org/files/article/450.pdf

১৮. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015. Islamic Financial Service board Malaysia.

দেশ) ইসলামী অর্থায়ন সম্প্রসারণের জন্য পাঁচ বছরের একটি চুক্তি করেছে। দেশগুলো হল বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান, কাজাকিস্তান ও ফিলিপাইন। চীন ২০১৫ সালে প্রথম ইসলামী ব্যাংক চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হংকং ইসলামী সিকিউরিটিজ লেনদেনে ট্যাক্স মওকুফ করেছে। জাপান এবং সিঙ্গাপুরও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক অব থাইল্যান্ড তার সুকুক অর্থায়ন ২০১৫ সালের শেষে (২৩৪ মিলিয়ন ডলার থেকে) ৫০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১৯]

সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, মরক্কো, আজারবাইজান ও উগান্ডায় ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়েছে। ওমানে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর তিন বছরের মধ্যেই তার জাতীয় অর্থনীতির ৪% এ পৌঁছে গেছে। ২০১৩ সালের শেষদিকে মালয়েশিয়ায় ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এ্যাক্ট চালু হয়েছে, যা দেশটির ইসলামী ব্যাংকিং ইতিহাসে অনেক বড় অর্জন। পাকিস্তানে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান লিক্যুইডটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং ইসলামী মানি মার্কেট চালু করেছে। কাতার শরীয়াহভিত্তিক ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স ফ্রেমওয়ার্ক চালু করেছে। তুরস্কে তিনটি সরকারী ব্যাংক পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং ইউনিট চালুর অনুমোদন পেয়েছে এবং তারা জার্মানীতে ইসলামী ব্যাংকিং লাইসেন্স এর আবেদন করেছে। লুক্সেমবার্গে সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়েছে।

৪. বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনীতির আকার

৪.ক. বৈশ্বিক ইসলামী সম্পদ

বিগত পাঁচ বছরে ইসলামী শরীআহ্‌ভিত্তিক সম্পত্তি দ্বিগুণ হবার পাশাপাশি বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭%। ২০১৪ সালের শেষে শরীআহ্‌ভিত্তিক সম্পদের পরিমাণ ২.০০ ট্রিলিয়ন ছাড়িয়েছে[২০]। বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনীতির ৭৮%ই ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ। এর বাইরে সুকূক(১৭%), ইসলামী ফান্ড(৪%) এবং তাকাফুল(১%)।[২১] ২০১৪ সালের শেষে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ ১৫২৬ বিলিয়ন ডলার, সুকূক ৩২৪ বিলিয়ন ডলার, ইসলামী ফান্ড ৭৮ বিলিয়ন ডলার এবং তাকাফুল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩ বিলিয়ন ডলার।[২২]

---

১৯. প্রাগুক্ত
২০. Hussain, Shamoradi and Turk, *An Overview of Islamic Finance.*
২১. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.
২২. প্রাগুক্ত

চিত্র ১ ও ২ বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্পদ ও তার অঞ্চলভিত্তিক বণ্টনের অবস্থা উপস্থাপিত হয়েছে:
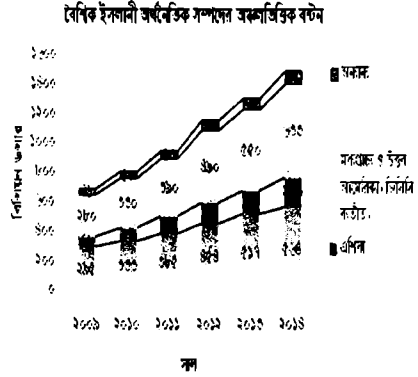
চিত্র ১: বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্পদ[২৩] **চিত্র ২: বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্পদের অঞ্চলভিত্তিক বণ্টন**[২৪]

সম্প্রতি পুঁজিবাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য; সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াসহ বিশ্বব্যাপী নতুন বাজার সম্প্রসারণ হলেও ইসলামী সম্পদের মূল অংশ মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত। জিসিসি[২৫] অংশে ইসলামী সম্পদের ৩৭.৬% এবং জিসিসি ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বাকি অংশ এবং উত্তর আফ্রিকায় ৩৪.৪% এবং এশিয়ায় রয়েছে ১১% সম্পদ।[২৬] বাংলাদেশে ইসলামী শরীআহভিত্তিক সম্পদ ২০% হলেও বিশ্ব ইসলামী অর্থনীতিতে অবদান ১%। মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত এবং আরব আমিরাত ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতির দেশ হিসেবে এবং বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক এবং পাকিস্তান ইতোমধ্যেই উদীয়মান ইসলামী অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে[২৭]। বিগত দশ বছরে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ১৭.৬%, তাকাফুল ৪২.৩% এবং ইসলামী ফান্ড ১২%।[২৮]

---

২৩. Oliver Wyman, *The Next Chapter in Islamic Finance*, 2015. https://ribh.files.wordpress.com/.../the-next-chapter-in-islamic-finance

২৪. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

২৫. সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান এবং বাহরাইন এই ছয়টি দেশ নিয়ে ১৯৮১ সালে উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা বা জিসিসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার সদরদপ্তর সৌদি আরবের রিয়াদে।

২৬. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

২৭. AT Kearny, Analysis: Future of Islamic Banking, 2014 https://www.atkearney.com/documents/10192/654853

২৮. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

চিত্র ৩ ও ৪ এর মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়:

চিত্র ৩: সেক্টরভিত্তিক বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্পদ[২৯] চিত্র ৪: বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি[৩০]

৪.খ. বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পত্তি

বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনীতির মূল অংশ ইসলামী ব্যাংকিং। বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্পত্তির ৭৮%ই ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ। ইরান ও সুদান তাদের শতভাগ ব্যাংকিং খাতকেই ইসলামিকরণ করেছে। নিম্নোক্ত ৫ ও ৬ নং চিত্রে বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্পত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পত্তির অংশ নিরূপিত হয়েছে:

চিত্র ৫: নিজ দেশে ইসলামী ব্যাংকিং শেয়ার[৩১] চিত্র ৬: বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পত্তির শেয়ার[৩২]

---

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. 2014: A Landmark year for Global Islamic Finance Industry. http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=106&bb=uploadpdf

বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পত্তির সবচেয়ে বড় অংশ ইরানে, যার পরিমাণ ৪১.২১%। এর পরেই সৌদি আরব (১৮.৫৭%) এবং মালয়েশিয়ার (৯.৫৬%)। সুদান তার শতভাগ ব্যাংকিং খাতকেই ইসলামীকরণ করলেও তার বৈশ্বিক অবদান মাত্র ১%। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের ১.৩৪%। সৌদি আরবের সম্পদের ৫১% ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ।[৩৩]

বাংলাদেশের মোট ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ নিজ দেশের ব্যাংকিং সম্পদের প্রায় ২০%। ২০১৪ সালের শেষে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬%। ২০১৪ সালের শেষে ১৭% প্রবৃদ্ধি নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর আকার ছিল ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলার[৩৪]। ২০১০-১৪ এই পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকিং এর গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭%।
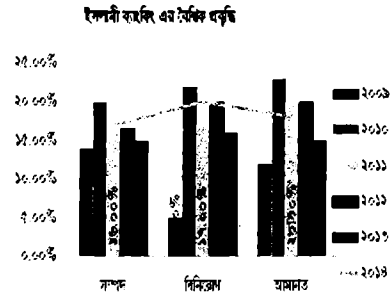
চিত্র ৭: ইসলামী ব্যাংকিং এর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি[৩৫]

২০০৯-২০১৪ এই পাঁচ বছরে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭%, বিনিয়োগের গড় প্রবৃদ্ধি ১৫% এবং আমানতের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮%।[৩৬]

৪.গ. বৈশ্বিক আমানত সংগ্রহ

২০১৪ সালের শেষে বৈশ্বিক আমানত এর গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫%, যার মোট পরিমাণ ছিল ৪১৬৫ বিলিয়ন ডলার। এপ্রিল ২০১৫ এ ইসলামী অর্থনীতির আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল ২১.৭%। এর বিপরীতে বৈশ্বিক আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৮.৯%[৩৭] যা ২০১৫ সালের এপ্রিলে ১৮.৯% এ দাঁড়িয়েছে। বৈশ্বিক আমানতের প্রবৃদ্ধির দিক থেকে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে কাতার। এর পরেই অবস্থান ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কের। ২০১০-২০১৪ এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের গড় আমানতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২০%।

---

৩৩. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.
৩৪. প্রাগুক্ত
৩৫. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.
৩৬. Standard and Poors Rating Services: Islamic Financial Outlook 2015
৩৭. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

	সংখ্যা	সম্পদ (বি.ড.)	ইক্যুইটি (বি.ড.)	নীট মুনাফা (বি.ড.)	বিনিয়োগ (বি.ড.)	আমানত (বি.ড.)	বিনিয়োগ থেকে আয় (বি.ড.)	আয় থেকে বণ্টন (বি.ড.)
বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংক	১৫০	১১২৭	১২৬	১২.৭	৭০৩	৭৩৭	৪১.৭	২৪.৮
প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো	৪৭৩	৪৯৬৬	৫৩২	৬৮.৯	২৯১৫	৩৪২৮	১৫০.৬	১০৩.১
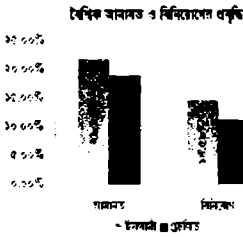
চিত্র ৮: বৈশ্বিক আমানত ও বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি[৩৮]
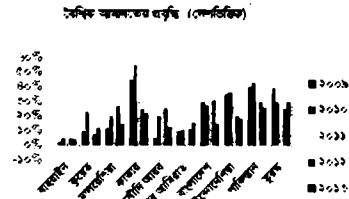
চিত্র ৯: বৈশ্বিক আমানতের প্রবৃদ্ধি[৩৯]

৪.ঘ. বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগ

২০১৪ সালের শেষে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং এর পরিমাণ ছিল ৩৬১৮ বিলিয়ন ডলার[৪০]। ২০১০-২০১৪ এই পাঁচ বছরে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগ এর প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে প্রায় ১৫%। উক্ত সময়ে বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়নের প্রবৃদ্ধির দিক থেকে ইন্দোনেশিয়া, কাতার, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের অবস্থান ছিল উল্লেখ করার মত।[৪১]
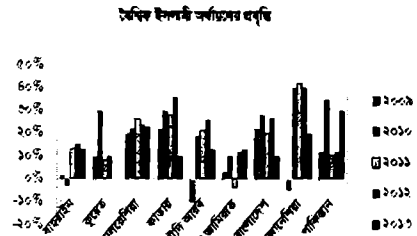
চিত্র ১০: বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়নের প্রবৃদ্ধি[৪২]

৩৮. Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness report 2014-15.

৩৯. প্রাগুক্ত

৪০. ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোসহ। সূত্র: Islamic Finance Country Index, 2014. www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. Islamic Finance Country Index, 2014. ww.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide

৪.ঙ. বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়নের বিপরীতে অর্জিত মুনাফা

২০১৪ সালের শেষে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ থেকে মুনাফা হয়েছে ১৯২.৬ বিলিয়ন ডলার, যা থেকে শেয়ারহোল্ডার এবং গ্রাহকদেরকে বন্টন করা হয়েছে ১৩০.৯ বিলিয়ন ডলার।[৪৩] ২০০৯-২০১৩ এই পাঁচ বছরে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং এর গড় মুনাফা ছিল মোটামুটি এক বিলিয়ন ডলার।[৪৪]
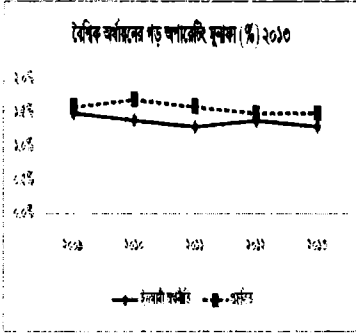
চিত্র ১১: বৈশ্বিক অর্থায়নের গড় অপারেটিং মুনাফা[৪৫]
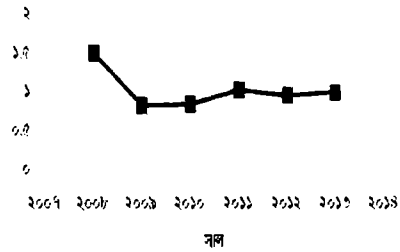
চিত্র ১২: বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং এর গড় মুনাফা[৪৬]

২০১৩ সালের শেষে গড় অপারেটিং মুনাফা হয়েছে ইসলামী অর্থায়নে ১.৪% এবং প্রচলিত অর্থায়নে হয়েছে ১.৫%। একই সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত অর্থায়নে ১.৮% এর বিপরীতে ইসলামী অর্থায়নে এই আয়ের পরিমাণ হয়েছে ০.৮%।[৪৭]

৪.চ. সম্পদের বিপরীতে আয় (Return on Asset)

২০১৩ সালের শেষে বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়নে সম্পদের তুলনায় আয় হয়েছে ১.৪%, যা প্রচলিত অর্থায়নে হয়েছে ১.৬%।[৪৮] একই সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত অর্থায়নে ১.৮% এর পাশাপাশি ইসলামী অর্থায়নে এই আয়ের পরিমাণ হয়েছে ১.১%। আর জিসিসি অঞ্চলে আয় হয়েছে ইসলামী অর্থায়নে ১.৪% এবং প্রচলিত বিনিয়োগে হয়েছে ১.৬%। সম্পত্তির বিপরীতে আয়ের বিবেচনায় সবচেয়ে

---

৪৩. Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-15
৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. Oliver Wyman, *Islamic Finance*, 2015- Greg Rung, Travis Hollingworth and Rico Brandenburg
৪৬. Thomson Routers, State of the Global Islamic Economy 2014-15 report.
৪৭. Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-15
৪৮. প্রাগুক্ত

বেশি মুনাফা অর্জন করেছে কাতার, সৌদি আরব এবং তুরস্ক। এর পরেই অবস্থান বাংলাদেশের।[৪৯] নিম্নের ১৩ ও ১৪ নং চিত্র দুটি এ সাক্ষ্য বহন করে:

চিত্র ১৩: বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং এর গড় ROA[৫০]

চিত্র ১৪: বৈশ্বিক অর্থায়নে সম্পদের তুলনায় আয়[৫১]

৪.ছ. ইক্যুইটির তুলনায় আয়(Return on Equity)

চিত্র ১৫: বৈশ্বিক অর্থায়নে ইক্যুইটির তুলনায় আয়[৫২]

বিশ্বমন্দা পরবর্তী ২০০৯-১৪ সময়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকসমুহের ROE[৫৩] এর প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়।[৫৪] ২০১৩ এর শেষে প্রচলিত অর্থনীতির ROE হয় ১৪%। এর বিপরীতে ইসলামী অর্থায়নের ROE দাঁড়ায় ১৩% এ।[৫৫]

---

৪৯. Oliver Wyman, *Islamic Finance.*

৫০. Oliver Wyman, *The Next Chapter in Islamic Finance.*

৫১. Oliver Wyman, *Islamic Finance.*

৫২. প্রাগুক্ত

৫৩. Return on Equity is the amount of net income returned as % of equity.

৫৪. Ernst & Young, *World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-15*

৫৫. প্রাগুক্ত

৪.জ. আয়-খরচ অনুপাত

বিশ্বমন্দা পরবর্তী বৈশ্বিক ব্যাংকিং রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক আরো কঠোর হওয়া এবং প্রভিশন বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকসমুহের cost-income ratio বেড়েছে।[৫৬]
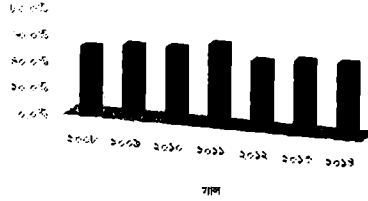
চিত্র ১৬: বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং এর আয়-খরচ অনুপাত[৫৭]

৫. ইসলামী ক্যাপিটাল মার্কেট: অগ্রগতির নিরিখে

বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়নে সবচেয়ে বিকাশমান খাত হলো ক্যাপিটাল মার্কেট, যা মূলত তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত যথা: ক) ইসলামী ইক্যুইটি মার্কেট খ) সুকুক এবং গ) ইসলামিক ফান্ড মার্কেট

৫.ক. ইসলামী ইক্যুইটি মার্কেট

শরীআহসম্মত ইক্যুইটি মার্কেটে ইনডেক্স প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থার সংখ্যা যেমনি বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে এর আন্তর্জাতিক মান। ১৯৯৯ সালে শুরু করা ডো জোন্স এর পরে স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওরস, এফটিএসই, এমএসসিআই ও রাসেল ইনভেস্টমেন্ট অন্যতম। ডো জোন্স ইতোমধ্যেই "ডো জোন্স টোটাল স্টক মার্কেট ইনডেক্স" এবং "ডো জোন্স ইসলামিক মার্কেট ওয়ার্ল্ড ইনডেক্স" চালু করেছে। প্রচলিত সুদভিত্তিক ইনডেক্স ব্যবহারকারীর প্রবৃদ্ধি যেখানে ৩.৬৭% সেখানে "ডো জোন্স টোটাল স্টক মার্কেট ইনডেক্স"এবং "ডো জোন্স ইসলামিক মার্কেট ওয়ার্ল্ড ইনডেক্স" এর প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪৭.২% এবং ৪৬.৪%।[৫৮]

---

৫৬. Ernst & Young, *World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-15.*

৫৭. Hussain, Shamoradi and Turk, *An Overview of Islamic Finance.*

৫৮. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

৫.খ. সুকূক[৫৯]
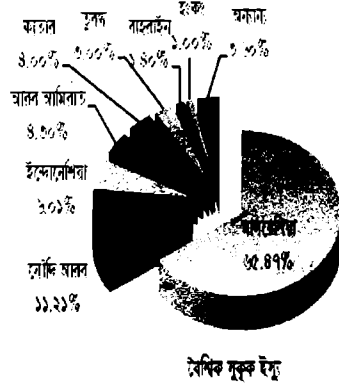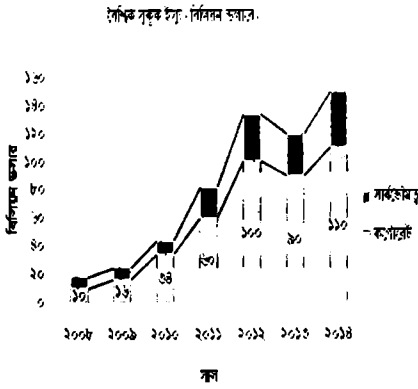
চিত্র ১৭: বৈশ্বিক সুকূক ইস্যু[৬০]

চিত্র ১৮: দেশভিত্তিক সুকূক ইস্যু[৬১]

শরীআহ্সম্মত বিনিয়োগে সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান খাত হলো সুকূক। সুকূককে ইসলামী ক্যাপিটাল মার্কেট এর ছাতা (umbrella) বলা হয়। একে ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল ইন্ডাসট্রিজ এর bellwetherও বলা হয়।[৬২] সুকূক মূলত স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড এবং সিন্ডিকেশন এর মাধ্যমে ইস্যু হয়। ২০১৪ সালের শেষে ২০.৮% প্রবৃদ্ধি নিয়ে বৈশ্বিক সুকূক আউটস্ট্যান্ডিং এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯৪.৭ বিলিয়ন ডলার। বিগত দশ বছরে বৈশ্বিক সুকূক ইস্যুর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪২.৩%। এর মধ্যে বিগত তিন বছরেই নতুন ইস্যু হয়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলার। বৈশ্বিক সুকূক এর ৬৫.৪৭% একাই ইস্যু করে মালয়েশিয়া। এরপর সৌদি আরব (১১.২%) এবং

---

[৫৯] ফারসী "জাক" শব্দ থেকে আরবীতে রূপান্তরিত হওয়া সুকূক শব্দের অর্থ "মৃদু আঘাত করা"। AAOIFI এর মতে সুকূক হল "সমমূল্যের এমন এক সনদ যা কোন বিদ্যমান নির্দিষ্ট সম্পত্তি (Tangible asset) অথবা সম্পদের উপস্বত্ব (Usufruct) অথবা সেবা (Services) অথবা নির্দিষ্ট কোন প্রকল্প বা বিশেষ বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধিভূক্ত সম্পত্তির বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।" সূত্রঃ আল-মায়াঈর আশ শারীয়্যাহ্ (শরীআহ্ মানদণ্ড), বাহরাইনঃ AAOIFI, ২০০৭, মানদণ্ড নং ১৭, পৃঃ ২৮৮।

[৬০] Standard and Poors Rating Services, Islamic Financial Outlook 2015

[৬১] Islamic Financial Review(ISFIRE)-Edbiz Consulting, vol-4, Issue-1, 2014, http://edbizconsulting.com/publications/ISFIRE_11_2014.pdf

[৬২] Nafith Al-Hersh, "The advancement of Islamic Banking and Finance in Global Markets", International Journal of Interdisciplinary Studies (IJIMS), 2014, vol-1, No 8, pp 11-18

ইন্দোনেশিয়া (৬.০১%)। ২০১৪ সালে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশ ইউ.কে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ায় প্রথমবারের মত সুকূক ইস্যু করেছে। এছাড়া ২০১৪ সালে লুক্সেমবার্গ (২০০ মিলিয়ন পাউন্ড), আরব আমিরাত (৭৫০ মিলিয়ন ডলার), সেনেগাল (১০০ বিলিয়ন ডলার), হংকং (১ বিলিয়ন ডলার) এবং দ:আফ্রিকা (৫০০ মিলিয়ন ডলার) নতুন বাজার হিসেবে সুকূক ইস্যু করেছে।[৬৩] ২০১৫ সালে জর্ডান, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, তিউনিশিয়া, কাজাকিস্তান ও মাল্টায় সুকূক ইস্যু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।[৬৪] সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সুকূক ইস্যু হয়েছে বাহরাইন, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া এবং কাতারে। কাজাকিস্তান ও তুরস্কে তারল্য ব্যবস্থাপনায় প্রধান বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সুকূক। IDB[৬৫] এবং IILM[৬৬] ইতোমধ্যে সুকূক ইস্যুর হার বাড়িয়েছে।[৬৭]
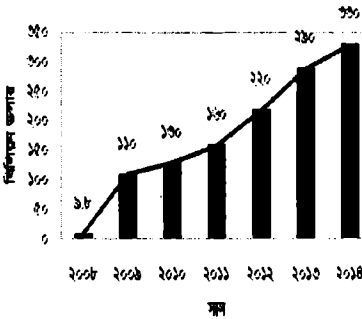
চিত্র ১৯: বৈশ্বিক সুকূক আউটস্ট্যান্ডিং[৬৮]

স্বল্প মেয়াদী (১ বছর বা তার কম সময়ে ম্যাচিউরিটি) এবং দীর্ঘ মেয়াদী (৩-১২ বছরে ম্যাচিউরিটি) সুকূক দুটিই বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়। ২০১৪ সালে জাপানী দুটি ব্যাংক সর্বপ্রথম ইয়েনে সুকূক ইস্যু করেছে। বাসেল-II/III পরিপালনের কারণেও সুকূক ইস্যুর হার বাড়ছে। পাশাপাশি গ্রীন ফাইন্যান্স এর জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যাকাত ফাউন্ডেশন এবং ওয়াকফ্ ফাউন্ডেশনেও সুকূক ব্যবহার বাড়ছে।[৬৯]

৫.গ ইসলামিক ফান্ড মার্কেট

বৈশ্বিক ইসলামী ফান্ড মার্কেটের সিংহভাগই (৩৮%) দখল করে আছে সৌদি আরব। এর পরই মালয়েশিয়ায় রয়েছে ২৪%। অর্থাৎ এই দুই দেশই বৈশ্বিক ইসলামী ফান্ড মার্কেটের

---

৬৩. 2014: A Landmark year for Global Islamic Finance Industry.

৬৪. Standard and Poors Rating Services, Islamic Financial Outlook 2015

৬৫. Islamic Development Bank ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার সদর দপ্তর জেদ্দায়।

৬৬. International Islamic Liquidity Management Corporation ২০১০ সালের ২৫ অক্টোবর মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬৭. Bloomberg, IFIS, Zawya, KFHR(Kuait Finance House Research)

৬৮. 2014: A Landmark year for Global Islamic Finance Industry.

৬৯. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

৬২% নিয়ন্ত্রণ করে।[৭০] বৈশ্বিক ব্যাষ্টিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তার কারণে শরীআহ্‌ভিত্তিক ফান্ড মার্কেট জনপ্রিয় হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে ইসলামিক ফান্ড এর প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৬%[৭১]। ২০১৪ সালের শেষে এই খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭৫.৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড এর প্রাতিষ্ঠানিক অংশ ২০% এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক অংশ ৮০% যেখানে বৈশ্বিক প্রচলিত সুদভিত্তিক মিউচুয়াল ফান্ড এর ৭০%ই প্রাতিষ্ঠানিক এবং মাত্র ৩০% অপ্রাতিষ্ঠানিক।[৭২] নিম্নের চিত্র দুটি থেকে বিষয়টি আবও স্পষ্ট হয়ে উঠে:
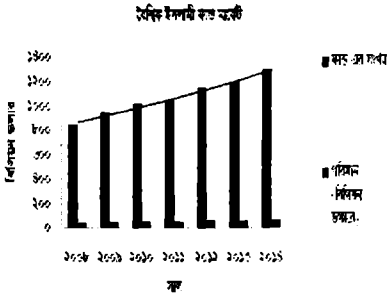
চিত্র ২০: বৈশ্বিক ইসলামী ফান্ড মার্কেট[৭৩]
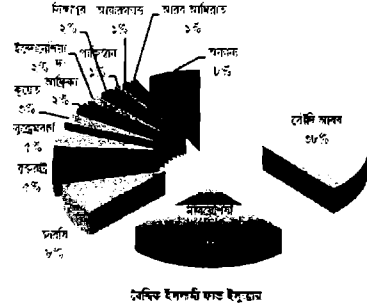
চিত্র ২১: বৈশ্বিক ইসলামী ফান্ড ইস্যুয়ার[৭৪]

৬. তাকাফুল[৭৫]

বৈশ্বিক ইসলামী বিনিয়োগে তাকাফুল দ্রুত বিকাশমান গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ২০০৯-২০১৪ সালে এই খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৮%। ২০১৪ সালের শেষে তাকাফুল এর মোট সম্পদ ছিল ২৩ বিলিয়ন ডলার, যার প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫%[৭৬]। বৈশ্বিক তাকাফুলের কেন্দ্রীয় অংশ মূলত জিসিসি এবং জিসিসি বহির্ভূত মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরেই। দেশ বিবেচনায় বিশ্বের সর্বাধিক তাকাফুল কোম্পানী মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরবে। এই দুই দেশের তাকাফুলের পরিমাণ বিশ্বের ৪৩.৭%। সৌদি আরবে

---

৭০. Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-15.

৭১. Zawya, Bloomberg, KFHR. পূর্বোক্ত

৭২. Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-15.

৭৩. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

৭৪. প্রাগুক্ত

৭৫. তাকাফুল একটি যৌথ গ্যারান্টি যা কোন গ্রুপ কর্তৃক ২য় পক্ষকে ভবিষ্যৎ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। Takaful is a cooperative system of reimbursement incase of loss, paid to people and co concerned about hazard, compensated out of a fund to which they agree to donate small regular contributions managed on behalf by a takaful operatior. সূত্র: Wikipedia, 14.11.2015

৭৬. প্রাগুক্ত

তাকাফুল কোম্পানীর মধ্যে ৪০ টি-ই ইন্সুরেন্স ইস্যু করে[৭৭]। বিশ্বের সবচেয়ে বড় তাকাফুল মার্কেট জিসিসি (৩৮%) এর ছয়টি দেশ, যার পরিমাণ ৯ বিলিয়ন ডলার[৭৮]। এর মধ্যে ৭৮টি কোম্পানী ইন্সুরেন্স ইস্যু করে। ২০১৪ সালে ওমান, কেনিয়া, মরক্কো, নাইজেরিয়া, দক্ষিন আফ্রিকা, তিউনিশিয়া, কাজাকিস্তান, আজারবাইজান, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড তাকাফুলের নতুন বাজার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এছাড়া বাহারাইনের কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালে তাকাফুলের অনুমোদন দিয়েছে। ২০১৪ এর শেষে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাকাফুলের পরিমাণ ছিল ৩.৯ বিলিয়ন ডলার, যা বৈশ্বিক তাকাফুল সম্পদের প্রায় ২০%।[৭৯] এর মধ্যে ৪২ টি কোম্পানীই ইন্সুরেন্স ইস্যু করে। ২০১৩ সালের শেষে তাকাফুল অপারেটরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৬ টি যেখানে ২০০৬ সালে ছিল ১৩৩ টি। গবেষণায় দেখা যায় মধ্যশ্রেণীর এবং তরুণ-যুবকদের কাছে তাকাফুল বেশি জনপ্রিয়। ইন্সুরেন্স হিসেবে তাকাফুল পারিবারিক ও চিকিৎসা খাতে সর্বাধিক জনপ্রিয় হলেও সম্পদ ও দুর্ঘটনা, মটর, সামুদ্রিক এবং আকাশপথেও তাকাফুল ইন্সুরেন্স ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে।[৮০]
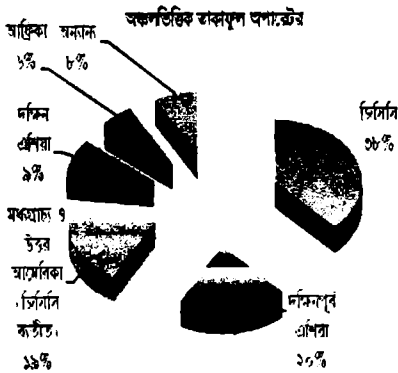
চিত্র ২২: বৈশ্বিক তাকাফুল অপারেটর[৮১]
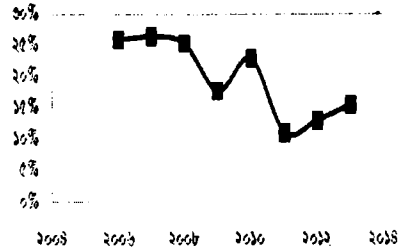
চিত্র ২৩: বৈশ্বিক তাকাফুলের প্রবৃদ্ধি[৮২]

---

৭৭. International Cooperative and Mutual Insurance Federation Directory, 2014

৭৮. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

৭৯. Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-15.

৮০. প্রাগুক্ত

৮১. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

৮২. প্রাগুক্ত

৭. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: ইতিহাসের পাতা থেকে

৭.১. ব্যক্তি উদ্যোগ

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে যশোর, কক্সবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় সুদমুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ নেয়া হয়, কিন্তু তৎকালীন প্রেক্ষাপটে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।[৮৩]

৭.২. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

ওআইসি অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে (ডাকার, আগষ্ট ১৯৭৪) আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকারীভাবে শরীআহভিত্তিক ব্যাংকিং এর প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়া হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে সেনেগালে ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, বাংলাদেশ সরকার তাতে একাত্মতা পোষণ করে।[৮৪] এরপর ১৯৭৯ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ মহসিন দুবাইয়ের ইসলামী ব্যাংকের আদলে বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক খোলার জন্য পররাষ্ট্র সচিবের নিকট চিঠি লিখেন। এরপর ১৯৮০ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক পাকিস্তানে ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক করার প্রস্তাব দেন। অত:পর ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে মক্কা ও তায়েফে তৃতীয় ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিজেদের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য সহজ করার লক্ষ্যে একটি আলাদা ব্যাংকিং গড়ার প্রস্তাব দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের চিঠি দেয়া হয়। সর্বশেষ ১৯৮১ সালের ৭ নভেম্বর বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক করার সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৮৫]

৭.৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ

এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক শুরু থেকেই অত্যন্ত সক্রিয় ও ইতিবাচক ছিল। ১৯৮০ সালে বিদেশের কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে, যারা ফিরে এসে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পেশ করেন। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

---

৮৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, "বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং: সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে", *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৫১

৮৪. এম আযীযুল হক, "শরীআহ্ ব্যাংকিং: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ", *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩৫

৮৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, "বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং: সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে", পৃ. ৫২

ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণকারীদের এগিয়ে আসার অনুরোধ করেন। এরপর ১৯৮১ সালের ১৮-১৯ মার্চ বিআইবিএম[৮৬] এর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দুই দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। একই বছরের ৯-১১ জুন সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইসলামী ব্যাংকিং ও ইন্সুরেন্স বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশ নেন। অত:পর ১৯৮২ সালের ১৬ অক্টোবর তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ব্যাংক মালিকদের ২৪তম সভায় তখনকার ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকের মেট্রোপলিটন ও জেলা শাখাগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৮৭]

৭.৪. অন্যান্য উদ্যোগ

১৯৭৯-৮২ সাল পর্যন্ত বেসরকারীভাবেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কাজ চলতে থাকে। বিআইবিএম, ইসলামিক ইকোনোমিক রিসার্চ ব্যুরো, বায়তুশ শরফসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উর্ধ্বতন ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে।[৮৮] সর্বশেষ ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ইসলামী ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি: ২০০১ সালে এবং হজ্ব ফাইন্যান্স কোং লি: ২০০৬ সাল থেকে ইসলামী অর্থায়ন করছে।[৮৯]

৮. বাংলাদেশে ইসলামী অর্থায়নের অগ্রগতি

৮.ক. উদ্দেশ্যভিত্তিক অগ্রগতি

ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কার্যক্রমে সার্বজনীন কল্যাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও সুষম বণ্টনকে গুরুত্ব দেয়। এই কারণে লাভজনক হলেও তামাক বা অকল্যাণকর খাতে কোনো বিনিয়োগ করেনি। এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থায়ন করে। অর্থায়ন ছাড়াও যাকাত, ওশর, সাদাকা, ওয়াকফ্‌সহ বিভিন্ন বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক পেমেন্টের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সম্পদ সঞ্চালিত করে। কল্যাণমুখী ব্যাংকিং, দরদি সমাজ গঠন, উত্তম সেবা ইত্যাদি শ্লোগান বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গির ধারা চিহ্নিত করে।[৯০]

---

৮৬. বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, যা ১৯৭৪ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮৭. প্রাগুক্ত

৮৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, "বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং: সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে", পৃ. ৫৩

৮৯. এম আযীযুল হক, "শরীআহ্ ব্যাংকিং: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ", পৃ. ৩৭

৯০. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, "বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং: সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে", পৃ. ৫৫

৮.খ. আর্থিক সূচকভিত্তিক অগ্রগতি

বর্তমানে বাংলাদেশ ৮টি পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যাংক, ৯টি প্রচলিত কনভেনশনাল ব্যাংকের ১৯ টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা, ৭ টি প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২৫ টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং করছে। চিত্র ২৪ ও ২৫ বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং এর সামগ্রিক অগ্রগতি উপস্থাপন করছে:
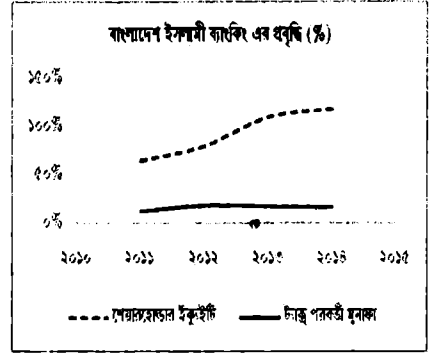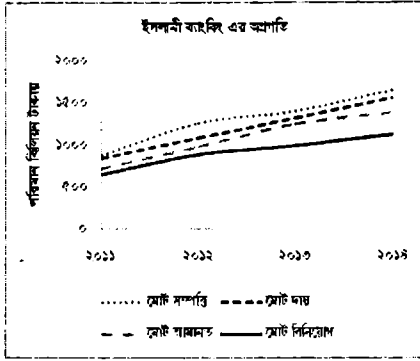
চিত্র ২৪: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর অগ্রগতি[৯১]

চিত্র ২৫: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রবৃদ্ধি[৯২]

গত পাঁচ বছরে (২০১০-১৪) দেশের ব্যাংকিং খাতে গড় আমানত প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.০৯%। এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.৬৮%। এ সময় ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৭.৫৩%। এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.৬৫%। আলোচ্য সময়ে ব্যাংকিং খাতে মোট সম্পদ বেড়েছে ১৯.৪৮%। এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলো সম্পদের প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে ২১.৩৪%। আলোচ্য পাঁচ বছরে ব্যাংকিং খাতে ইক্যুইটির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ২৬.২৬%। এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ইক্যুইটির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ২৩.৮৬%।[৯৩]

৮.খ.১. মানবসম্পদ

বর্তমানে দেশের ৯৬০ টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোতে ২৭৪৮৭ জন জনশক্তি কাজ করছে[৯৪]। দেশের মোট ৩৮৪ জন সার্টিফাইড ডকুমেন্টারি ক্রেডিট

---

৯১. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*

৯২. প্রাগুক্ত

৯৩. Department of Statistics, Bangladesh Bank, Corporation, FDB (ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো ব্যতীত) 2014.

৯৪. Bangladesh Bank, *Development of Islamic Banking in Bangladesh*, April-June 2015, Research Department,

স্পেশালাইজড এর মধ্যে ২০৬ জনই বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের।[৯৫] জনশক্তির পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি (আইবিটিআরএ) ১৯৯৮ সাল থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ডিপ্লোমা (ডিআইবি) চালু করেছে যেখানে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৩৯৮৭ জন কর্মকর্তা ডিগ্রি সম্পন্ন করেছে।[৯৬]

৮.খ.২. আমানত

২০১৪ সালের শেষে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট আমানত ছিল ১১৩৩৬০ কোটি টাকা, যা দেশের মোট আমানতের ১৮% এবং বেসরকারী ব্যাংকগুলোর মোট আমানতের ২৫.৫৮%। জুন ২০১৫ এর হিসেবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট আমানত গ্রাহক ছিল ১.২০ কোটি যা দেশের মোট আমানত হিসাবের ১৭.৯২% এবং বেসরকারী আমানত হিসাবের ৪২.১২%।[৯৭]
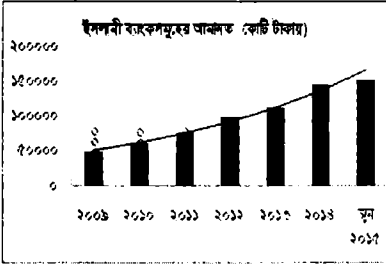
চিত্র ২৫: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানত[৯৮]

চিত্র ২৬: জুন ২০১৫ এ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানত[৯৯]

দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান ২২%। ২০০৯ সালে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৯১০০ কোটি টাকা যা ২০১৪ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪৬৫২৮ কোটিতে। অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে আমানত বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ।[১০০]

৮.খ.৩ বিনিয়োগ

২০১৪ সালের শেষে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগ ছিল ১১৩৩৬০ কোটি টাকা, যা দেশের মোট বিনিয়োগের ২১% এবং বেসরকারী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের ৩০.০৩%।[১০১]

---

৯৫. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫
৯৬. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*
৯৭. প্রাগুক্ত
৯৮. Bangladesh Ban, *Development of Islamic Banking in Bangladesh.*
৯৯. প্রাগুক্ত
১০০. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*
১০১. Bangladesh Bank, *Development of Islamic Banking in Bangladesh.*
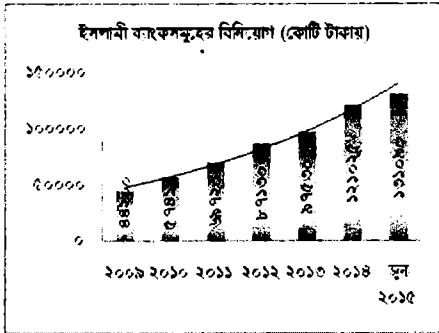
চিত্র ২৭: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ[১০২]
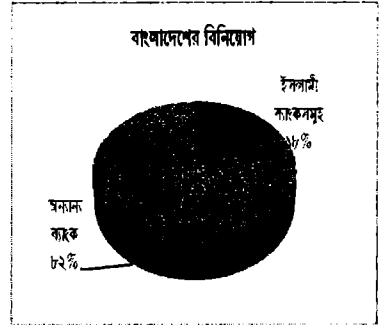
চিত্র ২৮: জুন ২০১৫ এ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ[১০৩]

৮.খ.৪. শ্রেণিকৃত বিনিয়োগ

২০১৪ সালের শেষে ব্যাংকিং খাতে মোট শ্রেণিকৃত বিনিয়োগ ছিল ৮.৯%। পক্ষান্তরে একই সময় ইসলামী ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত বিনিয়োগ ছিল ৪.২%। একই সময়ে ইক্যুইটির তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত বিনিয়োগ ছিল ৩৯.৯%[১০৪] যা দেশের ব্যাংকিং খাতের তুলনায় প্রায় ২০ ভাগ কম। ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংক এর চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ। ফলশ্রুতিতে মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি সঠিক সময়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো শেয়ারহোল্ডার এবং আমানতকারীদেরকে প্রচলিত ব্যাংক থেকে অধিক মুনাফা বণ্টনে সক্ষম হয়েছে।
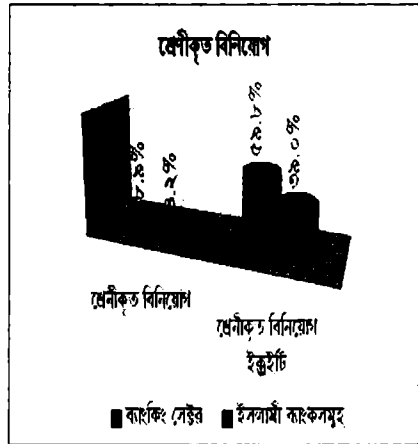
চিত্র ২৯: বাংলাদেশে শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ[১০৫]

---

১০২. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*

১০৩. Bangladesh Bank, *Development of Islamic Banking in Bangladesh.*

১০৪. প্রাগুক্ত

১০৫. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*

৮.খ.৫. সম্পদ

২০১৪ সালের শেষে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৩৫৯০০ কোটি টাকা, যা দেশের মোট ব্যাংকিং সম্পদের ১৭% এবং বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের ২৭.৪%। ইসলামী সম্পদের প্রায় ৯৮%ই ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ। জুন ২০১৫ সালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৫৫৬৬৬ কোটি টাকা।[১০৬]
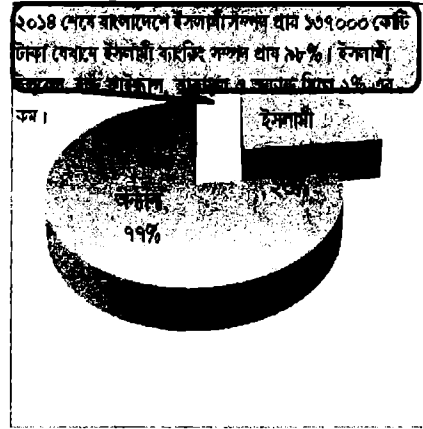
চিত্র ৩০: বাংলাদেশে ইসলামী সম্পদ
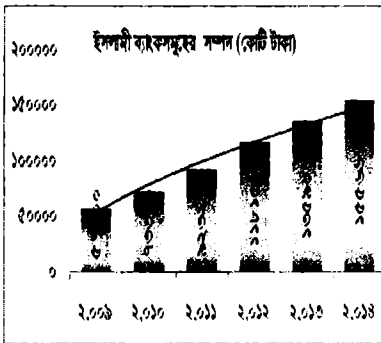
চিত্র ৩১: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সম্পদ[১০৭]
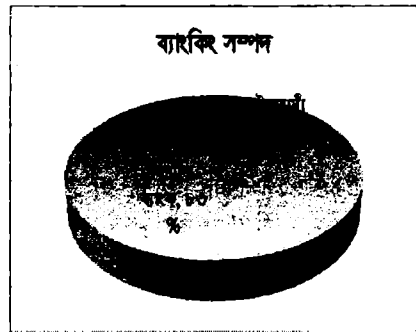
চিত্র ৩২: ২০১৪ শেষে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সম্পদ[১০৮]

---

[১০৬] Bangladesh Bank, *Development of Islamic Banking in Bangladesh.*

[১০৭] Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*

[১০৮] Bangladesh Bank, *Development of Islamic Banking in Bangladesh.*

৮.খ.৬. ইক্যুইটি
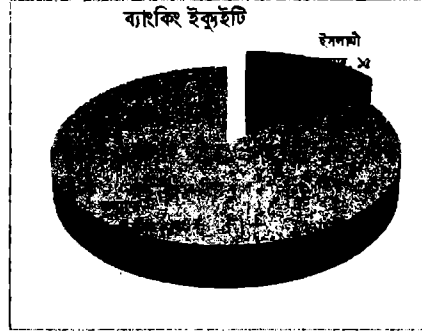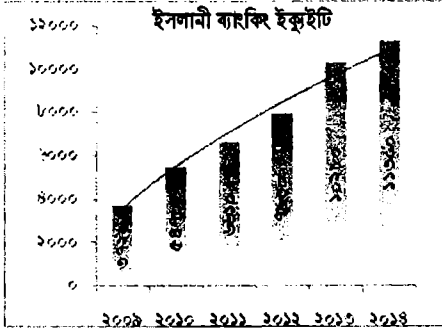
চিত্র ৩৩: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটি[১০৯]

চিত্র ৩৪: ২০১৪ শেষে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটি[১১০]

২০১৪ সালের শেষে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ইক্যুইটির মোট পরিমাণ ছিল ১০২৮০ কোটি টাকা, যা দেশের মোট ব্যাংকিং খাতের ১৫% এবং বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের ২৩.৪%। জুন ২০১৫ সালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১০৬৬২ কোটি টাকা।[১১১]

৮.খ.৭. বৈদেশিক রেমিটেন্স

২০১৪ সালের শেষে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিটেন্স এসেছে ১১৫৩০৭ কোটি টাকা, যা দেশের মোট ব্যাংকিং রেমিটেন্সের ২৮%।[১১২] জুন ২০১৫ এ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে রেমিটেন্স এসেছে ২৯.৫১%[১১৩]
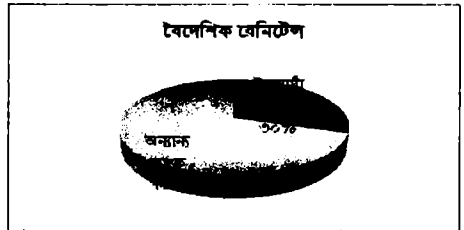
চিত্র ৩৫: বাংলাদেশে বৈদেশিক রেমিটেন্স[১১৪]

---

১০৯. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*
১১০. Bangladesh Bank, *Development of Islamic Banking in Bangladesh.*
১১১. প্রাগুক্ত
১১২. প্রাগুক্ত
১১৩. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*
১১৪. প্রাগুক্ত

৮.খ.৮. আমদানি

২০১৪ সালের শেষে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে আমদানি হয়েছে ৩৪৯৫২ কোটি টাকা, যা দেশের মোট আমদানির ২১%[১১৫]।
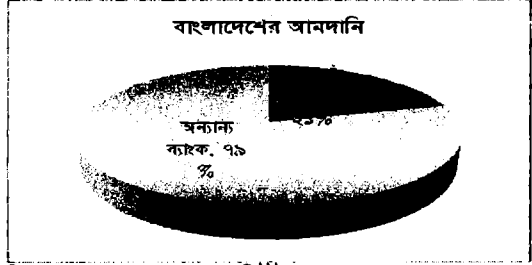
চিত্র ৩৬: বাংলাদেশের আমদানি[১১৬]

৮.খ.৯. রপ্তানি

২০১৪ সালের শেষে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রপ্তানি হয়েছে ৩৪৯৫২ কোটি টাকা, যা দেশের মোট রপ্তানির ২১%।[১১৭]
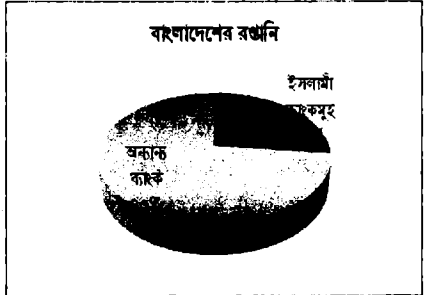
চিত্র ৩৭: বাংলাদেশর রপ্তানি[১১৮]

---

১১৫. Bangladesh Bank, *Development of Islamic Banking in Bangladesh.*
১১৬. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*
১১৭. প্রাগুক্ত
১১৮. প্রাগুক্ত

৮.খ.১০. আমানত-বিনিয়োগ অনুপাত

২০১৪ সালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত-বিনিয়োগ অনুপাত ছিল ৮৫.১% যেখানে সকল ব্যাংকের ছিল ৭১.২%। জুন ২০১৫ এ ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত-বিনিয়োগ অনুপাত ছিল ৮৫%। একই সময়ে দেশের ব্যাংকিং খাতে এই অনুপাত ছিল ৭২%।[১১৯]
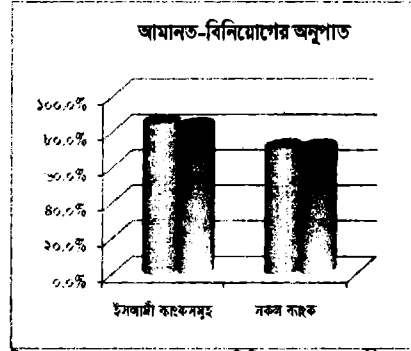
চিত্র ৩৮: বাংলাদেশে আমানত-বিনিয়োগ অনুপাত[১২০]

৮.খ.১১. মূলধন পর্যাপ্ততা এবং সম্পদ ও ইক্যুইটির তুলনায় নিট মুনাফার হার

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত শতকরা ১০ ভাগ মূলধন পর্যাপ্ততার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল ১২.১৬%। একই সময় দেশের মোট ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল ৯%। ২০১৪ সালের শেষে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ইক্যুইটিভিত্তিক গড় নিট মুনাফার হার ছিল ১৩ টাকা। একই সময়ে দেশের সার্বিক ব্যাংকিং খাতে এর পরিমাণ ছিল ১৪.১১ টাকা।[১২১] সম্পত্তির তুলনায় আয় ইসলামী ব্যাংকসমূহের আয় ছিল ৮.৭% যেখানে সকল ব্যাংকের ছিল ৬.৯%। ইক্যুইটির তুলনায় আয় ইসলামী ব্যাংসমূহের আয় ছিল ১১.৫% যেখানে সকল ব্যাংকের ছিল ৮.১%। সম্পত্তির বিপরীতে নীট মুনাফা ইসলামী ব্যাংসমূহের ছিল ২.৮% যেখানে সকল ব্যাংকের ছিল ১.৫%
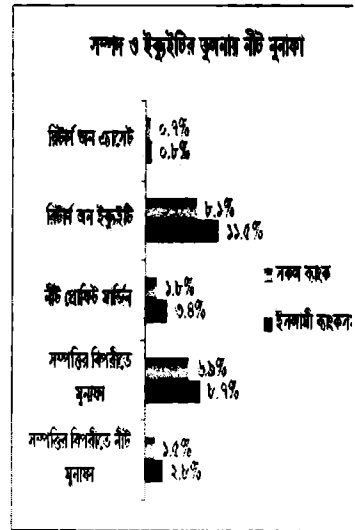
চিত্র ৩৯: বাংলাদেশে সম্পদ ও ইক্যুইটির তুলনায় নীট মুনাফা ২০১৪[১২২]

---

১১৯. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014.*

১২০. প্রাগুক্ত

১২১. প্রাগুক্ত

১২২. প্রাগুক্ত

৯. সিআরআর এসএলআর[১২৩]

২০১৪ সালে আবশ্যক সিআরআর ৬.৫% এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সিআরআর ছিল ৮.৩%। অন্যদিকে আবশ্যক এসএলআর ৫.৫% এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ছিল ১৩.৯%[১২৪] যেখানে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের আবশ্যক এসএলআর ছিল ১৯.৫%।[১২৫]
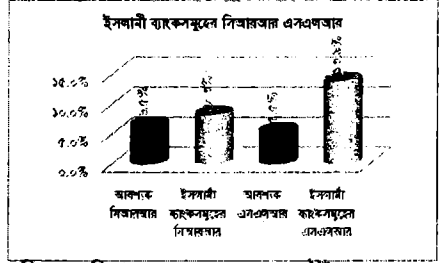
চিত্র ৪০: সিআরআর এসএলআর ২০১৪[১২৬]

১০. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং

২০১৪ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকগুলো শিল্পায়নে মোট বিনিয়োগের ২১.১% ধারণ করছে। এসএমই ও কৃষি খাতে দেশের আর্থিক খাতের মোট বিনিয়োগের ২৭.৯৬% বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প বিশেষ করে গৃহায়ন, পল্লী বিনিয়োগ, নারী উদ্যোক্তা ও ক্ষমতায়ন, গ্রীন ব্যাংকিং, ডাক্তার বিনিয়োগসহ দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকগুলো ২০১৪ সালে দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের ২১.৩% বিনিয়োগ করেছে। ২০১৪ সালে সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের ২৬.৫% বিনিয়োগ করেছে।[১২৭]
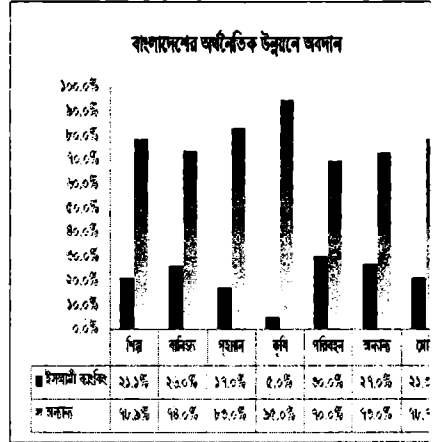
চিত্র ৪১: ২০১৪ শেষে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান[১২৮]

---

১২৩. CRR (Cash Reserve Requirement) হল আবশ্যক নগদ সংরক্ষণ যা সকল ব্যাংকের জন্য ৬.৫%। আর SLR (Statutory Liquidity Ratio) হল বিধিবদ্ধ জমা সংরক্ষণ যা ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য ৫.৫% এবং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের জন্য ১৩%।

১২৪. প্রাগুক্ত

১২৫. প্রাগুক্ত

১২৬. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2014*, পৃ. ৫৪

১২৭. প্রাগুক্ত

১২৮. প্রাগুক্ত

১১. বাংলাদেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাম্প্রতিক অগ্রগতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মিশন ''সামষ্টিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সামগ্রিক আর্থিক উন্নতি" এর সাথে ইসলামী অর্থনীতির চেতনা সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে; বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে শরীআহ্সম্মত পূন:অর্থায়ন সুবিধা চালু করেছে এবং সর্বশেষ নতুন ইসলামী ব্যাংক হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় পলিসি অনুসারে ব্যাংক কোম্পানি আইনের সাথে শরীআহ্ ব্যাংকিং এর সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য আলাদা পরিদর্শক দল গঠন করেছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা আইএফএসবি[১২৯], এএওআইএফআই সাথে সরকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে।[১৩০] এদেশে ইসলামী অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক কোম্পানি আইন না থাকলেও কিছু ধারা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক কোম্পানি আইনকে সাজানো হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকসমুহের মতোই ইসলামী ব্যাংকিংকে নিয়ন্ত্রণ করলেও শরীআহ্ পরিপালনের বিষয়টি নিজ নিজ শরীআহ্ কাউন্সিলের উপর ছেড়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক এর উদ্যোগে ''বাংলাদেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর জনাব ডঃ আতিউর রহমান উল্লেখ করেন, ''গ্রাহকের চাহিদার সুদৃঢ় ভিত্তি, আনুপাতিক হারে পর্যাপ্ত মূলধনের সংস্থান, অকার্যকর ঋণের আনুপাতিক কম উপস্থিতি, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় অধিকতর ভাল কার্য সম্পাদন, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলার সক্ষমতা অর্জন করেছে ইসলামী ব্যাংক।" ইসলামী ব্যাংকিংকে তিনি ''মূল্য সংবেদনশীল ও নৈতিকতাভিত্তিক, ফটকাবাজি বিমুখ, ঝুঁকির অংশীদারিত্ব, অধিকতর সামষ্টিক ও স্থিতিশীলতার সহায়ক বিধায় কৃষিকার্যে এসএমই ক্ষুদ্র অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী বলেন।[১৩১]

১২. বৈশ্বিক ইসলামিক অর্থায়নঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মার্কিন ডলার আরো শক্তিশালী হওয়া এবং মার্কিন সুদের হার কমানোর প্রভাব পড়েছে ইসলামী অর্থনৈতিক দেশসমূহসহ গোটা বিশ্ব অর্থনীতিতেই। ইসলামী অর্থনীতির ক্রিম অংশে আরব বসন্তের প্রভাব, সাম্প্রতিক

---

১২৯. Islamic Financial Services Board 2002 সালের ৩ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রধান কার্যালয় মালয়েশিয়ায়র কুয়ালালামপুরে।

১৩০. এম আযীযুল হক, "শরীআহ্ ব্যাংকিং: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"

১৩১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, "বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং: সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে"

ইউরোজোনে মন্দা,[১৩২] বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীনের মন্থরগতি,[১৩৩] তেলের দাম গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে যাওয়া[১৩৪] আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্চ তারল্য, মন্দ ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি, অলস অর্থের বৃদ্ধি, সুদের হার কমানো, মুনাফার প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে অধিক মনযোগ দিয়েছে। আইএমএফ এর ভাষ্যমতে, ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে।[১৩৫] আইএমএফ এর মতে, ২০১৪-১৫ বছরে বৈশ্বিক অর্থনীতি দুর্বল এবং অসমান (Weak and uneven)।[১৩৬] ২০১৪ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি মাত্র ৩.৭%, যা বিগত তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন[১৩৭]। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্থর গতির সর্বপ্রথম প্রভাব পড়ে ব্যাংকিং সেক্টরে। ২০০৭ সালের অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে বহু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হলেও এর বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে। ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেমে ব্যাংকার-গ্রাহক উভয়েই ঝুঁকি শেয়ার করায় বৈশ্বিক মন্দায়ও ইসলামী ব্যাংকিং খাত খুব ভালভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। বৈশ্বিক নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ইসলামী অর্থায়ন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। চীন ও জাপানের অর্থনীতিতে মন্থরগতি, জার্মানীতে প্রবৃদ্ধিহ্রাস, ইউরোপীয় ইউনিয়নজুড়ে মন্দা, তেলের দাম কমে যাওয়া, ব্যাংকগুলোতে অলস অর্থ বৃদ্ধি ইত্যাদি নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ইসলামিক অর্থায়ন প্রায় সব বিবেচনায়ই ভাল অবস্থানে রয়েছে যা শক্তিশালী, টেকসই, স্থিতিশীল অর্থনীতিরই ইঙ্গিত[১৩৮]। বাসেল-II এর Tier-I সম্পদ ইসলামী ব্যাংকসমূহে রেগুলেটরি প্রয়োজনের চেয়েও গড়ে ১৬.৮% বেশি ছিল, যা শক্ত ভিত্তিরই নির্দেশক[১৩৯]।

---

১৩২. ২০১৪ সালের অক্টোবরে আইএমএফ সতর্কতা দেয় যে, ইউরোজোন অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে যেখান থেকে বের হওয়া কঠিন হবে। দ্যা গার্ডিয়ান, ৭ অক্টোবর, ২০১৪।

১৩৩. ২০১৪ সালের শেষে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৩% যা দেশটির বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সূত্র: Hussain, Shamoradi and Turk, An Overview of Islamic Finance.

১৩৪. তেলের সরবরাহ বৃদ্ধি কিন্তু চাহিদা কমে যাওয়ায় তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪১ ডলারে নেমে গেছে যা গত পাঁচ বছরে সর্বনিম্ন। সূত্র: https://www.quandl.com/collections/markets/crude-oil dated 12.11.2015

১৩৫. দ্যা গার্ডিয়ান, ৭ অক্টোবর, ২০১৫

১৩৬. http://www.cnbc.com/2014/10/07/weak-and-uneven-imf-cuts-global-growth-forecast.html

১৩৭. Islamic Financial Services Industry Stability Report, May 2015.

১৩৮. Islamic Finance Country Index, 2014.

১৩৯. 2014: A Landmark year for Global Islamic Finance Industry.

ইসলামী অর্থায়ন মুসলিম দেশগুলোর পাশাপাশি পশ্চিমা সেক্যুলার বিশ্ব এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন ও রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধিসহ অগ্রসর হচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের পরিমাণ বাড়তে পারে প্রায় তিনগুণ এবং যার পরিমাণ হতে পারে ছয় ট্রিলিয়ন ডলার।[১৪০] বিগত পাঁচ বছরে সুকূক এর প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৪২% যা আগামী পাঁচ বছরেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। ইসলামী ব্যাংকিং, তাকাফুল, ইসলামী ফান্ড এবং সুকূক ক্রমেই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হচ্ছে। একুশ শতকে অ্যাসেট বেজড অর্থায়নে ইসলামী অর্থায়ন হতে পারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[১৪১]

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, হালাল ও অর্গানিক খাত, সামাজিক দায়বদ্ধ বিনিয়োগ ও ডেরিভেটিভস[১৪২] এ বড় অংকের বিনিয়োগে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের চ্যালেঞ্জ হল এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য ধরে রেখে যে কোন ধরনের বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা করা এবং এর বিকাশ সাধন। আন্তর্জাতিক বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকিং গতানুগতিক ব্যাংকিং এর চেয়ে ভালো আর্থিক সৌধ প্রস্তাব করে।[১৪৩] ইসলামী অর্থায়ন শিল্পকে একটি লেভেল প্লেইং ফিল্ড দেয়ার জন্য একটি সুপরিচালিত ইসলামী অর্থায়ন অবকাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য। এজন্য আরো প্রয়োজন উন্নত মানসম্পন্ন হিসাব, নিরীক্ষণ ও ডিসক্লোজার ব্যবস্থা, ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল সার্ভেইল্যান্স ফ্রেমওয়ার্ক। উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক, সুনিয়ন্ত্রিত এবং কল্যাণমূলক ইসলামী আর্থিক সৌধ গড়ে তোলা অবশ্যই সম্ভব। এজন্য দরকার অধিকতর অধ্যয়ন, গবেষণা এবং কথা ও কাজে আদর্শিক হিসেবে অনুকরণীয় হওয়া।

পরিণামদর্শী প্রবিধান ও তত্ত্বাবধানের সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও কর্পোরেট শাসন বাস্তবায়ন মিলিত হলে যে সহজাত মান তৈরি

---

১৪০. Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-15

১৪১. Hussain, Shamoradi and Turk, An Overview of Islamic Finance.

১৪২. ডেরিভেটিভস হল ঝুঁকি হ্রাসের একটি ইনস্ট্রুমেন্ট, যার মূল্য অন্য মৌলিক ভেরিয়েবল এর উপর নির্ভরশীল। সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যে এটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে সোয়াপ, ফিউচার, ফরওয়ার্ড এবং অপশন এই চার ধরনের ডেরিভেটিভস এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। তবে শরীয়াহ্ ব্যাংকিং এ এর কতটুকু ব্যবহার এবং কিভাবে করা সম্ভব তা নিয়ে এখনো গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া ২০০৭ সালে সর্বপ্রথম ইসলামী ডেরিভেটিভস চালু করেছে যার নাম "ইসলামিক প্রোফিট রেট সোয়াপ"। এছাড়াও বাহারাইনে "তাহাউত মাষ্টার এগ্রিমেন্ট" নামে ইসলামী ডেরিভেটিভস চালুর অনুমতি পেয়েছে যেটি মূলত সোয়াপ।

১৪৩. সাইয়েদ তাহির, "ইসলামী ব্যাংকিং এর ভবিষ্যৎ", *জার্নাল অব ইসলামী ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স*, ২০১০, ভলিউম ২২(৪), পৃষ্ঠাঃ ২১-৩৩

হয় তাতে ইসলামী ব্যাংকিং সুষমতা, স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতা অর্জনে প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি আদর্শ বিকল্প হতে পারে।[১৪৪] বিশ্বায়নের যুগে ইসলামী ব্যাংকিংসমূহের জন্য বাইরে থেকে আসা প্রতিযোগিতা এবং অধিগ্রহণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বৈশ্বিক সঙ্কটের স্থিতি ঘটলে দৃঢ় অবস্থানে থাকার পরেও ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি ব্যাংক খুব ভালো আর্থিক ভিত্তি নিয়ে চলতে পারে। তবে আমানতকারীরা যদি বুঝতে পারেন, কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংকটি শরীআহ্‌র হুকুম লঙ্ঘন করেছে তাহলে তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বিশুদ্ধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ ধারার ব্যাংকিং অনুশীলনকারীরা শরীআহ্‌র ব্যাপারে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন, দক্ষতা এবং বিশেষায়িত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। প্রাথমিকভাবে এটি হতে হবে নৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এর ব্যাংকারগণ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হবেন অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়। এই ব্যাংকের ইসলামী আর্থিক পণ্যের মানও হতে হবে প্রশ্নাতীত।[১৪৫]

রেগুলেটরি পরিপালনের পাশাপাশি সার্ভিসের মান আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছা ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলামী অর্থায়নের ROE, ROA এবং নীট মুনাফা প্রচলিত ব্যাংক অপেক্ষা কম থাকার কারণে এই অবস্থার পরিবর্তন আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলামী অর্থায়নের ভবিষ্যৎ আরো চ্যালেঞ্জের মধ্যে অনাথ, বিধবা, পেনশনভোগী ও সমাজের দূর্বল অন্যান্য শ্রেণির জন্য স্থিতিশীল আয়-প্রবাহের আর্থিক উপকরণ উদ্ভাবন, সরকারের চাহিদা পূরণ করার জন্য আর্থিক উপকরণ, অর্থায়নের নিরাপত্তার জন্য জামানত, বিশেষ দায় পরিশোধে খেলাপি হবার জন্য শরীআহ্‌সম্মত বিকল্প জরিমানার উপকরন উদ্ভাবন এবং ইসলামী আর্থিক পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য সূত্র তৈরি করা প্রয়োজন।[১৪৬] ইসলামী ব্যাংকসমুহে শুধু নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা নয় বরং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সাথে আন্ত:শিল্প প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

---

১৪৪. Tariqullah Khan, Demand for and supply of mark-up and PLS funds in islamic banking: some alternative explanations, সূত্র: http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/d ocuments/IDBDevelopments/intrrnet/English/IRTI/CM/downloads/IES_Articles/Vol%203…Tariqullah..DEMAND%20FOR%20AND%20SUPPLY%20OF%20MARK.pdf.

১৪৫. সাইয়েদ তাহির, "ইসলামী ব্যাংকিং এর ভবিষ্যৎ"

১৪৬. প্রাগুক্ত

সুদভিত্তিক অর্থনীতির তুলনায় ইসলামী অর্থনীতিতে প্রকৃত খাত ও আর্থিক খাত ভালোভাবে সমন্বিত হবে। আন্তঃব্যাংক মানি মার্কেট এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং ভবিষ্যতে নতুন রূপ নিতে পারে। এক্ষেত্রে শরীআহ্সম্মত বিভাজ্য ও বাণিজ্য উপযোগী আর্থিক উপকরণ এবং চুক্তির শরীআহভিত্তিক মানদন্ড এই নতুন রূপ পরিগঠনে সাহায্য করতে পারে। বাসেল এর পরিপালন যাতে শরীআহ্সম্মত হয় তার নকশা তৈরি করা আশু প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থায়ন গৃহীত হলে আন্তঃসরকার আর্থিক প্রবাহের ধরণ এবং আকার উভয়ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসতে পারে। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার শক্তিগুলো এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে থাকতে পারে। তাই অর্থায়নের সব ধরনের বিকল্প তৈরির প্রচেষ্টা থাকা কর্তব্য যেন সরকারীভাবে ইসলামী অর্থায়নে ঐক্যমত্যের ঘাটতি না হয়।

১৩. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রসারে কিছু সুপারিশ
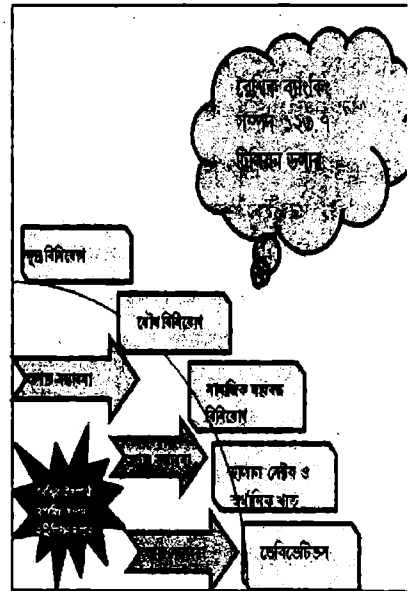
১৩.১ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অর্থবাজার চালু। Government Islamic Investment Bond (GIIB) এবং Islamic Mutual Fund (IMF) সীমিত আকারে চালু হলেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অর্থবাজার চালু হলে আরো বেশি সংখ্যক সুদভিত্তিক ব্যাংক দ্রুত ইসলামী ব্যাংকিং এর আওতায় আসবে।

১৩.২ আইডিবি সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে ইসলামীকরণের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে সরকারের আরো জোরালো ভূমিকা পালন।

১৩.৩ গ্রাহকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমুহের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফোরাম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।

১৩.৪ ইসলামী ব্যাংকারদের উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এদেশে নেই। এ জন্য সহযোগী কোন প্রতিষ্ঠানও গড়ে না ওঠায় একটি শূন্যতা রয়েই গেছে। এই শূন্যতা পূরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ।

১৩.৫ বাংলাদেশে দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমুহে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং' বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য কোর্সসমূহ প্রবর্তন করা।

১৩.৬ বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় ইসলামী ব্যাংকসমুহের শাখা সম্প্রসারন।

১৩.৭ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) এর অভিন্ন ও সমন্বিত হিসাবপদ্ধতি সকল ইসলামী ব্যাংক তাদের সকল কার্যক্রমে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ।

১৩.৮ মুসলিম দেশ বিশেষত যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়েছে সেসব দেশের সাথে আন্তঃবাণিজ্যে অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে ইসলামী কমন মার্কেট গঠন।

১৩.৯ ইসলামী ব্যাংকসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা ও সরকারী বেসরকারী কোন গুরুত্বপূর্ণ ফান্ড গঠনে সুকূক চালু করা, যা হতে পারে ইসলামী বন্ডের চেয়ে অধিক জনপ্রিয়।

১৩.১০ পুঁজিবাজারে সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা হলেও সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পৃথক ইসলামী আইন ও শরীআহ্ কাউন্সিল গঠন।

১৩.১১ ক্ষুদ্র ঋণ হতে পারে ইসলামী অর্থায়নের একটি বড় খাত।

১৩.১২. শরীআহ্ কম্প্ল্যায়েন্ট টুলস এবং নতুন প্রোডাক্ট এর ডেভলপমেন্ট করা। এজন্য গবেষণা বাড়ানো প্রয়োজন।

১৩.১৩. উন্নত বিশ্বে মানবসম্পদ নিয়োগ, আইটি বেজড ডেভলপমেন্ট এবং গুণগত মানোন্নয়ন এর সাথে পর্যালোচনা করে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমুহের বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

১৪. উপসংহার

ইসলামী অর্থনীতি আন্তর্জাতিক কাঠামোয় খুব দ্রুত একটি অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর সম্প্রসারিত নেটওয়ার্ক বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যোগসূত্র স্থাপন করছে, যা ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে দক্ষতার সঙ্গে সম্পদ বণ্টন করছে। এভাবে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সঙ্কটের মধ্যেও এর সম্প্রসারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বিধায় দিন আসছে ইসলামী তহবিল থেকে পশ্চিমাবিশ্ব এমনকি বহুজাতিক সংস্থার সাথে যৌথ বিনিয়োগে অংশ নেবার। ইসলামী অর্থায়ন এখনো শৈশবকাল অতিবাহিত করছে। আন্তর্জাতিকভাবে খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ হলেও ঋণ সৃষ্টির রীতি খুবই শক্তিশালী হওয়ায় বৈশ্বিক অর্থায়নে স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই প্রচলিত অর্থব্যবস্থার জন্য একটি বিকল্প হয়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র। বিশ্বব্যাপী বহুমুখী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে, ব্যবসার সুযোগও বাড়ছে। সাথে বাড়ছে বেসরকারী ইক্যুইটি, প্রকল্প অর্থায়ন, সুকূক ইস্যু, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অমুসলিমদের অংশগ্রহণ। পুঁজিবাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য; সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াসহ বিশ্বব্যাপী নতুন বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ইসলামী অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ, যেখানে ইসলামী অর্থনীতির অগ্রগতি লক্ষণীয়। গড়ে প্রায় ২০% প্রবৃদ্ধি এবং দেশের মোট ব্যাংকিং সম্পদের ২১.১% মার্কেট শেয়ার নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নন পারফরমিং বিনিয়োগের অংশ প্রচলিত ব্যাংকসমূহ অপেক্ষা ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনেক কম। বাংলাদেশের বড় বড় আর্থিক কেলেঙ্কারীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের নাম না আসায় এর প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমেই বাড়ছে। ক্ষুদ্র ঋণে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান এখনো ১০% এর কম তাই এটি হতে পারে ইসলামী অর্থায়নের একটি বড় খাত। এছাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন, হাউজিং, কৃষি, শিল্প, দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা কার্যক্রমে ইসলামী অর্থায়নের বিপুল সুযোগ রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় একুশ শতক শেষ হবার পূর্বেই দেশের শতভাগ ব্যাংকিং ইসলামিকরণ হবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬

বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণ ও প্রতিকার: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার*

Causes and Remedy of Global Economic Crisis: Islamic Perspectives

ABSTRACT

In conventional economics, economic crisis has become a common phenomenon. In the past century (1930-2014) the global economy experienced 14 huge economic crises leading to economic unrest and recession. World renowned economists have illustrated the causes and weakness of those recessions and recommended measures of how to overcome the crisis. Unfortunately they could not propose a sustainable model which would give a permanent solution. On the other hand, Islamic economists, bankers, and Sharī'ah experts identified the fundamental causes of the economic problems. According to them, Islamic finance which is based on profit and loss sharing method is the ultimate strategy to prevent economic crisis. In this context, this paper shows main causes of global economic crisis. The paper discusses and demonstrates how the Islamic econmic and financial system may serve as a remedy to the current system and prevent future economic recession. In writing this paper, descriptive analytical method was employed. Readers will know about the comparative idea and philosophy of Islamic and conventional economics and their role in establishing a sustainable and balanced economic system in the world.

Keywords: Economic crisis; interest based economy; Islamic economics; Islamic banking; recession of financial crisis.

---

* ইসলামী ব্যাংকার ও শরীআহ গবেষক।

সারসংক্ষেপ

প্রচলিত অর্থনীতিতে আর্থিক মন্দা একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিগত প্রায় এক শতাব্দী কাল (১৯৩০-২০১৪)-এর মধ্যে সংঘটিত প্রায় ১৪টি বড় বড় অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্ব অর্থনীতিকে চরম সঙ্কট ও অস্থিরতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর কারণ হিসেবে বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ প্রচলিত অর্থনীতির বিভিন্ন দুর্বলতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তা থেকে বেরিয়ে আসার নানামাত্রিক উপায় তুলে ধরেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোনো টেকসই মডেলের সন্ধান তারা দিতে পারেননি, যা দিয়ে বিরাজমান সঙ্কটের চিরন্তন সমাধান পেশ করা যায়। অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও শরী'আহ বিশেষজ্ঞগণ বাজার অর্থনীতিতে বিরাজিত বহুমুখী সঙ্কটের মৌলিক কারণগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে ইসলামের সম্পদ ও ঝুঁকিবণ্টনভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিকেই একমাত্র বিকল্প কৌশল হিসেবে দেখছেন। এ প্রবন্ধে বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের মূল কারণ এবং তার প্রতিকারে ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়ন পদ্ধতির অন্তর্নিহিত উপাদানগুলো কিভাবে সহায়ক হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে সে সম্পর্কে একটা বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণ ও তার পুনরাবৃত্তি রোধ করে স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি বিনির্মাণে প্রচলিত ও ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে।

মূলশব্দ: অর্থনৈতিক সঙ্কট; সুদভিত্তিক অর্থনীতি; ইসলামী অর্থনীতি; ইসলামী ব্যাংকিং; মন্দা প্রতিরোধ;

অবতরণিকা

সুদভিত্তিক প্রচলিত বাজার অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি বর্তমান বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট ও অস্থিরতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটি শুধু প্রচলিত অর্থায়ন ব্যবস্থাকেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে না; বরং বহু সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি করে চলেছে। প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতির সমালোচকেরা বলছেন যে, বিদ্যমান আর্থিক ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থনীতিকে সহায়তাদানের পথ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে এবং এ ব্যবস্থা আর তেমন কোনো কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক হচ্ছে না।

রিয়েল এ্যাস্টেট ব্যবসার পতন, অবিবেচনাপ্রসূত ঋণের ছড়াছড়ি, অতিমাত্রায় ঝুঁকিগ্রহণ প্রবণতা, ধ্বংসাত্মক বিনিয়োগ পদ্ধতির উদ্ভাবন, দুর্বল আইনি তদারকি ও অনুমাননির্ভর আর্থিক কর্মকাণ্ডকেই অনেকে বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের মূল কারণ হিসেবে দেখছেন। তবে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ শুধু এগুলোকেই সঙ্কটের মূল কারণ হিসেবে মানতে নারাজ। তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তিগত ও সহজাত দুর্বলতাকেই বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট ও অস্থিরতার মূল কারণ মনে করছেন। বিশেষ করে স্বার্থপরতা, মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দর্শন, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ, স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, মুদ্রার অপব্যবহার, দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি বর্তমান সঙ্কটের প্রত্যক্ষ কারণগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে সঙ্কটকে আরো গভীর, বিস্তৃত ও সর্বগ্রাসী করে

তুলছে। অনেকে এটিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও অর্থায়ন পদ্ধতির স্বয়ংক্রিয় ধস ও পতন হিসেবে আখ্যায়িত করতেও যুক্তিপ্রমাণ হাজির করছেন।

অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে যখন প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিপর্যস্ত ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে, তখনও শরী'আহসম্মত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবৃদ্ধি ছিল অপ্রতিরোধ্য। ২০০০-২০০৭ সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩০%-এর বেশি। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বিদ্যমান অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রভাব ফেলেনি। এতে ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়ন পদ্ধতির টেকসই গুণটির একটা পরীক্ষা হয়েছে বলেই মনে হয়।

প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতির নাজুক পরিস্থিতির পাশাপাশি থেকেও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে স্থিতিশীল থাকতে পারে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে (কার্যপত্র নং: ডব্লিউপি/১০/২০১), বৈশ্বিক সঙ্কটকালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর গড় লাভ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মতো একই থাকলেও মুনাফা ছিল অধিকতর স্থিতিশীল। পাশাপাশি, এগুলোর সম্পদ ও ঋণ প্রবৃদ্ধি প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এগুলোর 'এক্সটার্নাল রেটিং'ও ছিল অনুকূল।

ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির স্থিতিশীলতা ও টেকসই যোগ্যতার বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর জেতি আখতার আজিজ ও তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর দুরমাস ইলমাজ। তারা জোর দিয়ে উল্লেখ করেন, ইসলামী অর্থায়নের সহজাত শক্তিমত্তা হলো আর্থিক লেনদেন ও উৎপাদনশীল পুঁজিপ্রবাহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শাসন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার 'বিল্ট-ইন-ডাইমেনশনস' (built-in-dimensions) এবং অত্যধিক লিভারেজ ব্যবহার এবং ধ্বংসাত্মক আর্থিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। এগুলোই ইসলামী অর্থায়নের সম্ভবপরতা (viability) ও স্থিতিশীলতায় অবদান রেখেছে।[১]

২০০৭-২০০৯ সালের আর্থিক সঙ্কট প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতিকে সুস্থতা ও স্থিতিশীলতার বিষয়ে বহু ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি অধিকতর টেকসই সমাধান খুঁজে পেতে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে। আর্থিক সঙ্কট ও মন্দার কবল থেকে অর্থনীতিকে রক্ষার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হলেও তা সফল হয়নি। এর জন্য প্রয়োজন স্থায়ী সমাধান, এর মৌলিক পরিবর্তন ও পদ্ধতিগত সংস্কার সাধন, যাতে অর্থনীতিকে তার মৌলিক ভূমিকায় ফিরিয়ে দেওয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিকে একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে দেখছেন অনেকেই।

---

১. ওআইসি আউটলুক সিরিজ, মে ২০১২; *ইসলামী ব্যাংকিং*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৬৮

অর্থনৈতিক মন্দার কারণ বিশ্লেষণ

প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা, উচ্চ হারের মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব, বাণিজ্য ঘাটতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য ও শেয়ার বাজারের পরিবর্তনশীলতা বারবার টেনে আনে অর্থনৈতিক মন্দা ও সামষ্টিক সঙ্কট। কিন্তু এর কারণ ও প্রতিকার কী? অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ তা বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মতে, আয়বৈষম্য, অল্প কিছু ব্যক্তি ও কোম্পানির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়া, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ (concentration), অবাধ বাজার অর্থনীতি (open market economy), সুদ (interest), সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস (subprime mortgage crisis), ঋণ বিক্রি, ফটকাবাজি (speculation), স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস ও অপচয়, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয়, ব্যাংকব্যবস্থার ত্রুটি, অর্থের অপব্যবহার, নিয়ন্ত্রণহীন অর্থনীতি ইত্যাদি বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের প্রধান কারণ।

নিচে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মন্দা সৃষ্টির প্রধান প্রধান কারণ উল্লেখ করা হলো:

১. পুঁজিবাদী অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি

পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে স্থবিরতা। এর প্রথম ও প্রধান কারণ হলো পুঁজিবাদের নৈতিক কোনো ভিত্তি না থাকা। পুঁজিবাদী অর্থনীতির গঠন-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যই এমন যে, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে চলে যায় এবং পুরো অর্থনীতি লগ্নিনির্ভর হয়ে পড়ে। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির সাবেক অধ্যাপক মিনস্কি যিনি সমাজতন্ত্রের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তিনি ১৯৬০ এর দশকের শুরুর দিকে 'ফাইন্যানসিয়াল ইন্সট্যাবিলিটি হাইপোথিসিস' বা 'আর্থিক অস্থিতি ধারণা' গড়ে তোলেন। তার ধারণায় যুক্তি দেখানো হয় যে, অগ্রসর পুঁজিবাদী অর্থনীতির আর্থিক কাঠামো একটি অন্তর্গত ত্রুটি প্রদর্শন করে, যা এটিকে অক্লান্তভাবে চালিত করছে তেজী অবস্থা থেকে নাজুক অবস্থার দিকে আর এভাবে অবশেষে গোটা অর্থনীতিকে ঋণ-চুপসে যাওয়ার কাছে সহজেই কাবু করে ফেলে। মহা মন্দার সময় এটাই দেখা গেছে।[২]

২. মুক্তবাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিগুলোর মধ্যে 'লেইসেজ-ফেয়ার (Laissez-fair)' ও 'মুনাফা সর্বোচ্চকরণ' গুরুত্বপূর্ণ। লেইসেজ-ফেয়ার-এর অর্থ হলো 'করতে দাও'। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িতদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দাও। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অদৃশ্য হস্ত বা বাজার প্রক্রিয়াই সবকিছুর নির্ধারক।

---

২. জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *মহা আর্থিক সঙ্কট: কারণ ও পরিণতি*, অনুবাদ: ফারুক চৌধুরী, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ১৭

বাজার অর্থনীতির এ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাজারব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে না বললেই চলে, ফলে ব্যবসায়ীগণ যেকোনোভাবে মুনাফার দিকে দৌড়াতে থাকে, যা অর্থনৈতিক মন্দার একটি বড় কারণ। এ কারণে 'বিশ্ব প্রচার মাধ্যমসমূহ বাজারে অর্থনীতির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে বলে সমস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল।'[৩]

জর্জ সোরোস পর্যন্ত এই কথা স্বীকার করেছেন যে, 'লেইসেজ ফেয়ার পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য ব্যাপ্তি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাজার-মূল্যবোধের সম্প্রসারণ আমাদের মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে। আমি বিশ্বাস করি সাম্যবাদী নয় বরং পুঁজিবাদী হুমকিই মুক্ত সমাজের প্রধান দুশমন।'[৪]

প্রকৃতপক্ষে মুক্তবাজার অর্থনীতি মুনাফা অর্জন ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার মানসিকতা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিণতিতে, এই মুনাফার মানসিকতাই সকল অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

৩. সাবপ্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট

২০০৭-২০০৯-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার পেছনে সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিসকে (subprime mortgage crisis) বড় কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়। সাবপ্রাইম মর্টগেজ হলো এমন এক ধরনের ঋণ, যা এমন ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করা হয়েছে যার যথেষ্ট সামর্থ্য নেই এবং অতীতে ঋণ গ্রহণের পর তা পরিশোধের রেকর্ড যার দুর্বল।

সাব-প্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার বহু কারণের ভিত্তি হিসেবে সে দেশের অর্থনীতিকে একটি জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। কবির হাসান পিএইচডি দেখিয়েছেন যে, সাবপ্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট সৃষ্টির মূলে যেসব উপাদান সক্রিয় ছিল সেগুলো হলোঃ সুদ, ঋণ বিক্রি, সিকিউরিটাইজেশন, দুর্নীতি, ফটকাবাজি, অবাধ অর্থনীতি, শর্ট সেলিং ইত্যাদি। তিনি নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।[৫]

---

৩. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, তরজমা- অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা: নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৪. *ক্যাপিটাল ক্রাইমস*, অন্টলান্টিক মানথলি, জানুয়ারি, ১৯৯৭

৫. Kabir Hassan, Ph.D., *The financial crisis and the Islamic Finance Solution*, www.sesrtcic.org/imgs/news/image/presentation-FinCrisisAndIFSolution.pdf
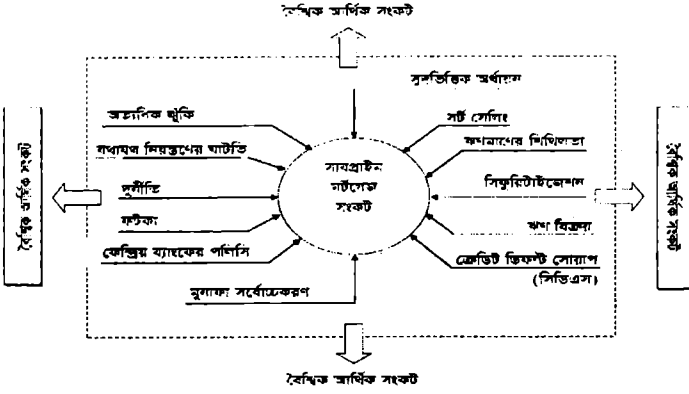
৪. ঋণ বিক্রি

ঋণ বিক্রি (Sale of Debt) অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ। মন্দাকালে আমেরিকার ব্যাংক ব্যবস্থায় চলছিল এক অভিনব পদ্ধতি। সেখানে ব্যাংকগুলো ঋণের অর্থ দীর্ঘদিন যাবৎ আদায় না করে ঋণগুলোকে তৃতীয় পক্ষের কাছে লাভে বিক্রি করে দিত। এই তৃতীয় পক্ষ ছিল আমেরিকার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বা বিনিয়োগ ব্যাংক। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের দায়িত্ব ছিল ঋণ আদায় করা। কিন্তু তারা ঋণ আদায় না করে লোন রিকভারি এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করে দিত। এভাবে ঋণ বিক্রি বা স্থানান্তরের কারণে ঋণ পরিশোধের প্রবণতা দারুণভাবে হ্রাস পায়।

৫. তত্ত্বাবধানের অভাব

ব্যাংকগুলো কোথায় কিভাবে ঋণ দিচ্ছে তা তত্ত্বাবধান করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব। কিন্তু আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফার নেশায় যেখানে-সেখানে ঋণ প্রদান করেছে। যথাসময়ে সে ঋণ আর ফিরে আসেনি। একটি শক্তিশালী, কার্যকর ও গতিশীল আর্থিক নীতি ও যথার্থ তত্ত্বাবধানের অভাবে অর্থনৈতিক মন্দা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

আইএমএফ (IMF) ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (World Bank)-এর অতিমাত্রায় নজরদারির কারণে স্বল্পোন্নত ও কম উন্নয়নশীল দেশগুলো অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হয়নি। কিন্তু যাদের অর্থে আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক চলে তাদের আর্থিক শৃঙ্খলার ওপর নজর রাখার সাহস প্রতিষ্ঠানগুলো দেখায়নি।

৬. কৃত্রিম ও অবাস্তব লেনদেন

অর্থনৈতিক অস্থিরতার পেছনে আরো যে উপাদানটি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে তা হলো কৃত্রিম ও অবাস্তব লেনদেন। প্রতিদিন বিশ্বব্যাপী যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আর্থিক

লেনদেন সম্পন্ন হতে দেখা যায় যার শতকরা ৯৫ ভাগই হচ্ছে কৃত্রিম লেনদেন। এর সঙ্গে প্রকৃত লেনদেনের (Real Transaction) কোনো সম্পর্ক নেই।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্ট এই ভিত্তিহীন লেনদেন আজ 'ফিউচারস' ও 'অপশনস'-রূপে উদ্ভূত অর্থের (Derivative) মাধ্যমে বিশ্ববাজারে ফটকা কারবারের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আর এটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে।

উদ্ভূত অর্থের সাবেক ব্যবসায়ী ফ্রাংক পার্টুনি (Frank Partony) বলেছেন, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও অস্থিরতার কারণ অনেক। কিন্তু আপনি যদি বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য কোনো একটি বিশেষ শব্দকে অভিযুক্ত করতে চান, তাহলে সে শব্দটি হবে উদ্ভূত অর্থ (Derivative)।[৬]

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন গ্রে তার লেখা 'অলীক প্রভাত' (False Dawn) নামের গ্রন্থে মন্তব্য করেন, প্রতিদিন প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের অর্থ বিনিময় হচ্ছে, যা বিশ্ব বাণিজ্য মূল্যের পঞ্চাশ গুণেরও বেশি। মাইকেল অ্যালবার্টের মতে, বিশ্বের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ৯০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমান, যা ফ্রান্সের বার্ষিক GDP-এর সমান এবং বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহে সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের চেয়ে প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি।

আরও এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, 'বিশ্বে সর্বমোট ১৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক পরিমাণ উদ্ভূত অর্থ রয়েছে। অথচ বিশ্বের সর্বমোট ১৮৮টি দেশের এউচ হচ্ছে মাত্র ৩০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।'[৭]

কৃত্রিম আর্থিক লেনদেন অর্থনীতিকে অপ্রকৃত অবস্থার (virtual economy) দিকে নিয়ে যায়, যা মৌলিক ও প্রকৃত অর্থব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড ও বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। ১৯৯০ সালে বৃটেনের প্রাচীনতম ব্যাংক ব্যারিংস-এর পতনে এটাই দেখা গিয়েছিল।[৮]

৭. ব্যাংকের কৃত্রিম মুদ্রা সৃষ্টি

আধুনিক প্রচলিত ব্যাংকের কৃত্রিম মুদ্রা সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো 'নাই (Nothing)' থেকে অর্থ সৃষ্টি করে। একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক অভিনব প্রক্রিয়ায় তাদের কাছে আমানত হিসেবে রাখা মোট অর্থের দশগুণের বেশি ঋণ প্রদান করতে পারে। আমানত থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো

---

৬. Frank Partnoy, FIASCO-Blodd in the Water on Wall Street, http:/www.npr.org/templates/story.php?storyld=102325715

৭. ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ*, পৃ. ৮৮

৮. জন গ্রে, *ফলস ডন দি ডিলিউশন্স অব ক্যাপিট্যালিজম*, লন্ডন: গ্র্যান্টি বুকস, ১৯৯৮, পৃ. ৬২

কৃত্রিম মুদ্রা সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনাব রহিম তার ব্যাংক হিসাবে ১,০০,০০০/= টাকা জমা দিল। ব্যাংক উক্ত জমা হতে ১০% তারল্য রেখে বাকি ৯০,০০০/= টাকা জনাব করিমের ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করল। পুনরায় জনাব করিমের টাকা থেকে ১০% তারল্য রেখে ৮১,০০০/= টাকা জনাব খালিদের হিসাবে ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করল। এভাবে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ আমানত থেকে বার বার ঋণ দিয়ে প্রায় ১০ গুণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে। তাই দেখা যায়, বাজারে সরবরাহকৃত মুদ্রার সিংহভাগই ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট কৃত্রিম অর্থ। এখানে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল অর্থের পরিমাণ খুবই কম। বর্তমানে অনেক দেশে সরকারের ইস্যুকৃত প্রকৃত অর্থের অনুপাত কমে যাচ্ছে, বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক 'নাই' থেকে সৃষ্টি করা কৃত্রিম অর্থের অনুপাত ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালে সে দেশে মোট অর্থ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৬৮০ বিলিয়ন পাউন্ড; এর মধ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটের পরিমাণ ছিল ২৫ বিলিয়ন পাউন্ড, যা মোট অর্থের ৩.৬% মাত্র। বাকি ৬৫৫ বিলিয়ন পাউন্ডই ছিল ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট কৃত্রিম মুদ্রা। অর্থাৎ, মোট অর্থ সরবরাহের ৯৬.৪% হচ্ছে কৃত্রিম বা উদ্ভূত অর্থ। এটি কেবল সংখ্যা; কম্পিউটার দিয়ে এ সংখ্যা সৃষ্টি করা হয়েছে, এর পেছনে বাস্তব দ্রব্যসামগ্রীর কোনো অস্তিত্ব নেই।[১] একে বলা যায়, শূন্যের ওপর সৃষ্ট শূন্যের বুদ্বুদ। এই বুদ্বুদ যেকোনো মুহূর্তে ফেটে গলে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় মহাসঙ্কট।

৮. প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার প্রকৃতি

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা আজ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এটি আয়বৈষম্য বৃদ্ধি ও গরিব শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বহু মানুষের নিকট থেকে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করা অর্থ ব্যাংক কমসংখ্যক পুঁজিপতির হাতে ঋণ হিসেবে অর্পণ করে। পুঁজিপতি সেই অর্থ দিয়ে উক্ত জমাকারীগণের সাথে ব্যবসা করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। অন্যদিকে প্রচলিত ব্যাংকের অধিকাংশ লেনদেনই অবাস্তব ও অবোধ্য; যা অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার বড় কারণ। তাই মানুষ আজ উপলব্ধি করছে যে, অর্থ, ব্যাংক ও আর্থিক পদ্ধতির কার্যক্রম হচ্ছে অবাস্তব, অবোধ্য, বে-হিসেবী, দায়িত্বহীন, শোষণমূলক ও নিয়ন্ত্রণহীন।

৯. শর্ট সেল বা মালিকানা অর্জন ছাড়াই কোনোকিছুর বেচাকেনা

শর্ট সেল (Short Sale) হলো কোনো পণ্যের ওপর মালিকানা ও দখল ব্যতীতই তা বিক্রি করে দেয়া। শেয়ার মার্কেটে এর প্রচলন রয়েছে বেশি। শেয়ার বিনিয়োগকারী মুনাফার আশায় এটিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। মূল্য বৃদ্ধির

---

১. ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

কারণে শেয়ারের চাহিদা বেড়ে গেলে এবং শেয়ার বিনিয়োগকারীর নিকট চাহিদার সমপরিমাণ শেয়ার না থাকলে তিনি অন্যের নিকট থেকে শেয়ার ধার নিয়ে বাজারদরে ক্রেতার নিকট বিক্রি করে দেন। পরবর্তী সময়ে কম দামে বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় করে ধার পরিশোধ করেন।

এ ছাড়া আধুনিককালে ফটকাবাজির ওপর ভিত্তি করে যেসব বেচাকেনা সম্পন্ন হয় তার অধিকাংশই হয় পণ্যের ওপর বিক্রেতার মালিকানা অর্জন ছাড়া। এখানে বেচাকেনার মাধ্যমে পণ্য ক্রয় কোনো উদ্দেশ্যই নয়; বরং দুই বেচাকেনার মধ্য থেকে মুনাফা হাতিয়ে নেয়াই উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে শুধু কৃত্রিম লেনদেন সম্প্রসারিত হয়, যার সাথে প্রকৃত লেনদেনের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের কৃত্রিম লেনদেন অর্থনৈতিক সঙ্কট ও অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১০. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

সুদ অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মন্দা সৃষ্টির প্রধান উপাদান। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং অর্থনৈতিক মন্দার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আবার পুঁজির চাহিদা কমে গেলে ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয়। ফলে উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। এ কারণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ও মন্দা কেটে যায়। এভাবে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন কোনো অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর নয়। 'সুদ ও সুদের হারের বদৌলতে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পব্যবস্থা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলার পরিবর্তে একটি ব্যবসায়িক চক্করে (Trade cycle) পড়ে যায়। ফলে তা বারবার মন্দার শিকারে পরিণত হয়।'[১০]

সুদ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোক্তার ক্রয়মূল্যে প্রবেশ করে এবং যখন দ্রব্যমূল্য ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়, তখন মন্দা থেকে মহামন্দা দেখা দেয়। একই কারণে বিনিয়োগ, শেয়ার, পণ্য ও মুদ্রা বাজারে দারুণ অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

১১. ঋণনির্ভর অর্থব্যবস্থা

অর্থনৈতিক মন্দার আরও একটি বড় কারণ হলো ঋণনির্ভরতা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হ্যারি ম্যাগডফ ও সুইজি স্থবিরতা ও 'ফাইন্যানসিয়ালাইজেশন' বা 'লগ্নিয়ায়ন' এর মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। তাদের যুক্তি হলো, লগ্নিয়ায়ন ছাড়া অর্থনীতি টিকে থাকতে পারে না এবং অবশেষে, এটিকে সাথে নিয়েও অর্থনীতি টিকে থাকতে পারে না।[১১]

---

১০. ডাঃ ফরিদউদ্দিন আহমাদ, "সুদ বনাম ব্যবসা-বণিজ্যঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ", *দৈনিক সংগ্রাম*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই ২০০৪

১১. ফস্টার ও ম্যাগডফ, *মহা আর্থিক সঙ্কট*, পৃ. ২১

অধিকাংশ উন্নত দেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঋণের তলায় ডুবে গেছে। এ ঋণের পরিমাণ অনেক দেশের GDP-এর পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যে গৃহস্থালি (household) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের মোট বার্ষিক আয়ের শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত হয়েছে।[১২] বিশ্বব্যাপী এই ঋণনির্ভর ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ।

১২. মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দর্শন

পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে লাগামহীন মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়। ফলে জনকল্যাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ব্যবসায়ীগণ মুনাফা অর্জনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের কাছে মুনাফার চেয়ে বড় কোনো দেবতা নেই। তাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়াই বড় কথা এবং এ লক্ষ্যে সুদ, জুয়া ও ফটকাবাজি সবই বৈধ মনে করা হয়। মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে এই বেপরোয়া সীমালঙ্ঘন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আরো একটি বড় কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার আগে বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো মুনাফার জন্য ব্যাপক ঝুঁকি নিয়েছিল। বিনিয়োগ ব্যাংকের 'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বোনাসের জন্য লালায়িত হয়ে নৈতিক দায়িত্ব পায়ে ঠেলে দিয়েছিলেন।'[১৩] মোটা অঙ্কের বোনাসের জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহীদেরকে মোটা বিড়াল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন ওবামা।[১৪]

১৩. নৈতিক অবক্ষয়

অর্থনৈতিক তত্ত্বকে যারা বাস্তব রূপ দেন তাদের মন-মানসিকতা ও নৈতিকতার ওপর সে তত্ত্বের সাফল্য ও স্থিতিশীলতা অনেকখানি নির্ভরশীল। ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় নীতিনৈতিকতার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। যা একটি অর্থনীতিকে দ্রুত অস্থিরতার দিকে চালিত করে। কারণ, ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ করার আর কোনো ব্যবস্থা থাকে না। এক্ষেত্রে স্বার্থপরতা, জিনিসপত্রের মূল্য ও মুনাফা ধর্মীয় মূল্যবোধের স্থান দখল করে নেয়। ব্যক্তি মানুষের অভ্যন্তরীণ চেতনার মধ্যে কার্যকর বিবেকবোধ তখনও কিছুটা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করলেও, ব্যক্তি ও সমাজ-স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য যে সামগ্রিক নিয়ামক ব্যবস্থা থাকা দরকার তা আর কার্যকর থাকে না।[১৫]

নৈতিকতা বিষয়ে উইল ও এ্যরিয়েল ডুরান্ট-এর বাণী খুবই প্রণিধানযোগ্য। তারা মন্তব্য করেছেন, 'ধর্মের সাহায্য ছাড়া কোনো সমাজ উচ্চ নৈতিক মান বজায় রেখেছে, ইতিহাসে

---

১২. ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ*, পৃ. ৭৯

১৩. নাসির আহমদ, "বেপরোয়া বিনিয়োগ ব্যাংকের দায়", *মাসিক ব্যাংকার*, নভেম্বর ২০০৮

১৪. *দৈনিক আমার দেশ*, ১৬ জানুয়ারি ২০১০

১৫. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), ২০০০, পৃ. ৪৭

এর কোনো উদাহরণ নেই।[১৬] তাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন। যেখানে দেখানো হয়েছে যে, ১৯৯১ সালে মাত্র এক সপ্তাহেই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ একের পর এক সমস্যাসঙ্কুল বিভিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল: চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যা, জালিয়াতি, প্রতারণা ইত্যাদি।[১৭]

আমেরিকার বৃহৎ ২০০০ কর্পোরেশনের ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার, কর্মচারী অপহরণ, স্বার্থের সংঘাত, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিয়োগ ও পদোন্নতি বৈষম্য, কোম্পানির অর্থ ও সম্পদের অপব্যবহার, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি সমস্যা কোম্পানির ম্যানেজারবৃন্দকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।[১৮]

বর্তমানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নৈতিকতার সমস্যাটি ক্রমবর্ধমান। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এ বিষয়টি উদ্বেগজনক। বিশ্বব্যাপী ৩০০টি কোম্পানির ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিরোধ, অর্থনৈতিক উপঢৌকন, যৌন হয়রানি ও অবৈধ লেনদেন-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণকে ভাবিয়ে তুলেছে।[১৯]

১৪. ভোগবিলাস ও অপচয়

বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে উদ্যোক্তাগণ এর উৎপাদনের প্রতি বেশি মনোযোগী হয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন কমিয়ে দেয়। ফলে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে সাধারণ মানুষ মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

আমেরিকায় স্বল্পসংখ্যক মানুষের হাতে অধিকাংশ সম্পদ রয়েছে। তারা অতিমাত্রায় ভোগবিলাসে আসক্ত হয়ে পড়েছে। ভ্রমণ, বিনোদন ও ক্রীড়াকৌতুকের নামে ব্যয় করছে বিপুল পরিমাণ অর্থ, করছে জমকালো আনন্দ অনুষ্ঠান। খাবারদাবার, পোশাক ও জীবনের সর্বত্র চলছে বিলাসিতা ও অপচয়। এই লাগামহীন ভোগবিলাস অর্থনীতিকে মন্দার কবলে ঠেলে দেয়।

বিত্তবানদের অলংকারাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়িঘর ও পানাহারের বিলাসী উপকরণ ও নারী সৌন্দর্য চর্চার ন্যায় অতি সূক্ষ্মানুভূতির বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার পরিণামে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে গোটা পৃথিবীর মানুষ এ বিপর্যয়ের দায়ভারে ধ্বংসের শিকারে পরিণত হবে।

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৭. রফিক ইসা বীকুন, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), ২০১৪, পৃ. ৯

১৮. *আমেরিকা'স মোস্ট প্রেসিং অ্যাথিকস প্রবলেমস*, ওয়াশিংটন ডিসি: দি অ্যাথিকস রিসোর্স সেন্টার, ১৯৯০, পৃ. ১

১৯. বীকুন, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, পৃ. ৯-১০

১৫. ফটকাবাজি ও জুয়ার প্রসার

প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে (যেখানে প্রকৃতই কোনো পণ্য ও সেবা প্রদান করা হয়) বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন অনেকটা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে সহজে মুনাফা লাভের আশায় বিভিন্ন সিকিউরিটির মাধ্যমে লগ্নির প্রসার ঘটানো হয়। এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকে প্রতারণা ভরা নানা কৌশল। ফটকাবাজি ও জুয়া খেলার বহু পথ রয়েছে। স্টক বা শেয়ার, ফিউচার, ডেরিভেটিভস, মুদ্রার বিনিময়সহ বহু ধরনের আর্থিক দালালির মাধ্যমে ফটকাবাজির প্রসার ঘটে।

দৈনিক প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের অর্থ বিনিময় হচ্ছে, যা বিশ্ব বাণিজ্যমূল্যের পঞ্চাশ গুণের অধিক। এ লেনদেনের শতকরা ৯৫ ভাগই হচ্ছে ফটকামূলক। ১৯৯০ সালে বৃটেনের প্রাচীনতম ব্যাংক ব্যারিংস-এর পতনে এটাই দেখা গেছে।'[২০]

ম্যাগডফ ও সুইজি ব্যাখ্যা করে দেখান যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে দানবাকার কর্পোরেশনগুলো গড়ে ওঠার সাথে সাথে পুঁজিবাদী অর্থনীতির গঠন-প্রকৃতিতে গুণগত রূপান্তর ঘটে। অনেক ধরনের ও অনেক পরিমাণে কর্পোরেট সিকিউরিটি বা কোম্পানির শেয়ারপত্র ছাড়া হয়। এটা সাথে নিয়ে আসে সংগঠিত শেয়ার ও বন্ড বাজার, এসবের দালালি প্রতিষ্ঠান, নতুন ধরনের ব্যাংক ব্যবসায়, কিছু লোকের জোট, যাদেরকে ভেবলেন লগ্নির কাপ্তান বলে অভিহিত করা যায়। তাদের দৃষ্টিতে 'শেয়ার বাজার আর মুদ্রা-বাণিজ্য বিশাল বিশাল জুয়াখানার চেয়ে ভিন্ন রূপ নিয়েছে সামান্যই; সেখানে লেনদেনের সংখ্যা ও মূল্য এতো বেড়েছে যে, তার সাথে আনুপাতিক বিচারে মূল অর্থনীতির কোনো মিল নেই।'[২১]

মুদ্রা বাণিজ্যে ফটকাবাজি আরো আকর্ষণীয়। ২০০৬ সালের এক হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে দৈনিক গড়ে ১.৮ ট্রিলিয়ন মুদ্রা বাণিজ্য হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় প্রতি ২৪ দিনে যে পরিমাণ মুদ্রা বাণিজ্য হয় তা সমগ্র বিশ্বের বার্ষিক জিডিপির সমান।[২২]

আধুনিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেন এমন রূপ ধারণ করেছে যে তার সাথে জুয়ার পার্থক্য করা কঠিন। স্যার আরনেস্ট কেসল একজন ব্যাংকার। তিনি সপ্তম এডওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আমি যখন যুবক ছিলাম মানুষ তখন আমাকে জুয়াবাজ বলত। আমার কাজের পরিধি যখন বিস্তৃত হলো তখন আমি ফটকাবাজ

---

[২০]. ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ*, পৃ. ৭৪

[২১]. ফস্টার ও ম্যাগডফ, *মহা আর্থিক সঙ্কট*, পৃ. ১৭

[২২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

নামে পরিচিতি পেলাম। এখন আমি একজন ব্যাংকার হিসেবে খ্যাত। কিন্তু সত্য কথা হলো সবসময় আমি একই কাজ করে আসছি।'[২৩]

১৬. লেনদেনের অস্বচ্ছতা

বৈশ্বিক অর্থিক সঙ্কটের ক্ষেত্রে লেনদেনের অস্বচ্ছতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক আর্থিক বাজারগুলোতে এমন অনেক লেনদেন রয়েছে যা স্বচ্ছতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। এ লেনদেগুলো এতোটাই জটিল ও কঠিন যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অর্থশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণ পর্যন্ত তা বুঝতে হিমশিম খেয়ে যান। জর্জ সরোজ (George Soros) ১৯৯২ সালে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তিনি মাত্র এক দিনে শর্ট সেলিং-এর মাধ্যমে ১০ বিলিয়ন পাউন্ড লেনদেন করে ১ বিলিয়ন পাউন্ড মুনাফা লুটে নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সালে ব্যাংকিং পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে মর্টগেজ সিকিউরিটি সঙ্কটের কারণ ব্যাখ্যায় জটিল আর্থিক ডেরিভেটিভ-এর বিবরণ তুলে ধরেন– 'জটিল ধরনের অনেক আর্থিক ডেরিভেটিভ-এর ছড়াছড়ি রয়েছে। এর মধ্যে কোনো-কোনোটি এতোই জটিল ও রহস্যঘেরা যে এর মধ্যে বিদ্যমান ঝুঁকি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি করা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অর্থ বিশেষজ্ঞ ও পুঁজি বিনিয়োগকারীদের পক্ষেও বেশ কঠিন। আমি নিজেও এসব বিনিয়োগকারীর অন্তর্ভুক্ত। এসব আর্থিক ডেরিভেটিভ-এর মধ্যে বিশেষভাবে এমন কিছু ইন্সট্রুমেন্ট রয়েছে যা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের জন্য জুয়া খেলার পথ প্রশস্ত হয়।'

এ প্রসঙ্গে রিচার্ড থমসন মন্তব্য করেন যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অনেক বিনিয়োগকারী লোভের বশীভূত হয়ে নির্বোধের মতো ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে। তাদের কাছে নিত্যনতুন এমনসব অর্থিক ইন্সট্রুমেন্টের প্রস্তাব করা হয়, যার ঝুঁকিগুলো তারা বুঝতেই পারে না। অনেক বিনিয়োগকারীর অবস্থা তো এমন যে, তাদের ভাষা আর ব্যাংকের ভাষা বিপরীত। একে অপরের ভাষা বুঝতেই সক্ষম নয়।'[২৪]

১৭. আয়বৈষম্য

আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দার পূর্ববর্তী সময়ে আয়বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিত্তবানদের তোষণ করা ছিল বুশ প্রশাসনের মূল বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রের তিন জন শীর্ষ শিল্পপতির মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মিলিত

---

২৩. Justice Mufti Muhammad Taqi Usmani, *Present Financial Crisis Causes And Remedies From Islamic Perspective*, blog.yurizk.com/file/2014/12/presen-fFinancial- crisis-cCauses -and –remedies-from-iIslamic-perspective-.pdf

২৪. প্রাগুক্ত

GDP-এর চেয়ে বেশি।[২৫] মন্দার পূর্ববর্তী ৭ বছরে বিত্তবানদের আয় বেড়েছে ৬শ' ৭০ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অক্সফাম-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ মানুষের সম্পদ অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশের মোট সম্পদের সমান। আর বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫০ শতাংশের সমপরিমাণ সম্পদ ৬২ জন শীর্ষধনীর করায়ত্তে।[২৬] মন্দার প্রাক্কালে দরিদ্র মানুষের আয় কমলেও ওয়াল স্ট্রিটের শীর্ষ নির্বাহীদের বেতন-ভাতা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছিল। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোনো-না-কোনোভাবে ৯০% সম্পদ চলে যায় ১০% উচ্চবিত্তের নিয়ন্ত্রণে আর ১০% সম্পদ থাকে ৯০% নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের হাতে। ফলে বিপুল প্রাচুর্যের পাশাপাশি অবস্থান করে ব্যাপক দারিদ্র্য। ক্ষুধা ও ভোগবিলাসের এই বিপরীত অবস্থান সৃষ্টি করে মানসিক অস্থিরতা, হিংসাবিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা।

১৮. একচেটিয়া পুঁজি

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পুঁজির একটি বিরাট অংশ কতিপয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়। এটি অর্থনৈতিক স্থবিরতাকে স্বাগত জানায়। পল বারান ও পল সুইজি তাদের লেখা 'মনোপলি ক্যাপিটাল' বইতে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, 'একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে স্থবিরতা।'[২৭]

হার্ভার্ডে অর্থনীতির সাবেক অধ্যাপক সুইজি ও স্ট্যামফোর্ডে অর্থনীতির সাবেক অধ্যাপক বারান পুঁজিবাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 'একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপুল উৎপাদনশীলতা আর নিয়ন্ত্রিত মূল্য নির্ধারণ বিপুল ও ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত তৈরি করে। এ উদ্বৃত্ত এতোই বেড়ে যায় যে, তা শুষে নেওয়ার ক্ষমতা ভোগ ও বিনিয়োগের স্বাভাবিক পথগুলোতে অর্থনীতি থাকে না।'[২৮] ফলে কার্যকর চাহিদা কমে যায়, যা অর্থনীতিকে স্থবিরতা ও মন্দার দিকে ঠেলে দেয়।

১৯. অর্থের অপব্যবহার

বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের একটি বড় কারণ হলো অর্থের অনর্থ। মুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে সৃষ্টি করা হলেও আধুনিক অর্থনীতিতে তা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একজন ব্যবসায়ী যেমন কেনা দামের চেয়ে বেশি দামে

---

২৫. এম এ খালেক, "যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকট কোন দেশকেই রেহাই দেবে না" *পাক্ষিক অর্থজগত*, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৬, নভেম্বর ২০০৮

২৬. *দৈনিক বণিক বার্তা*, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৫

২৭. পল এ বারান ও পল এম সুইজি, *মনোপোলি ক্যাপিটাল: অ্যান এসে অন দি আমেরিকান ইকোনোমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অর্ডার*, নিউ ইয়র্ক: মান্থলি রিভিয়্যু প্রেস, ১৯৬৬, পৃ. ১০৮

২৮. ফস্টার ও ম্যাগডফ, *মহা আর্থিক সঙ্কট*, পৃ. ১৭

কোনো পণ্য বিক্রি করতে পারে তেমনি অর্থের মালিকও অর্থকে তার ফেস ভ্যালু (Face Value)-এর চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারে। অথবা কোনো ব্যক্তি যেমন তার কোনো স্থায়ী সম্পদ ইজারা দিয়ে তার ওপর ভাড়া আদায় করতে পারে, তেমনি অর্থের মালিকও অর্থ ধার দিয়ে তার ওপর সুদ আদায় করতে পারে। অথচ মুদ্রা বা অর্থের নিজস্ব কোনো উপযোগ নেই। এজন্য অ্যাডাম স্মিথ অর্থকে 'মৃত মওজুদ' (dead stock) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আবার কিনসের তত্ত্বানুযায়ী- 'money is neither a consumption good, nor a production good, it is a medium of exchange.' অর্থাৎ, 'অর্থ যেমন ভোগ্য পণ্য নয়, তেমনি তা উৎপাদনশীল পণ্যও হতে পারে না; বরং অর্থ হচ্ছে বিনিময়ের একটি মাধ্যম মাত্র।'[২৯]

কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে অর্থ কামানোর চেষ্টা করা হয়। এভাবে অর্থ দিয়ে অর্থ কামানোর প্রচেষ্টা অর্থনীতির জন্য শুভকর নয়। পণ্য হিসাবে অর্থের ব্যবহারকে ১৯৩০-এর মহামন্দার কারণ হিসাবে দায়ী করে প্রতিবেদন পেশ করেছিল মন্দার কারণ চিহ্নিত করণের জন্য গঠিত ইকোনমিক ক্রাইসিস কমিটি। এ কমিটি মন্দা থেকে উত্তরণের উপায় বাতলে যে সুপারিশমালা তৈরি করেছিল তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল, 'মুদ্রা যাতে বিনিময় ও বন্টনের মাধ্যম হিসেবে সত্যিকার অর্থে কাজ করতে পারে সে জন্য পণ্য হিসেবে অর্থের কারবার বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।'[৩০]

২০. দুর্নীতি

ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থায় ইহজীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করা হয়। মৃত্যুর পরে আর কোনো জীবন নেই- এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ যেকোনোভাবে সম্পদ অর্জনকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনে করে। এক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। পরের সম্পদ আত্মসাৎ করতে এতটুকুও হাত কাঁপে না। তাই দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক মন্দায় দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের ইসলামী প্রতিকার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যেখানে অর্থনৈতিক সমস্যাকে খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতির সাথে সাথে আকীদা-বিশ্বাস, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও নৈতিকতার সম্পর্ক গভীর ও

---

২৯. Ludwing Von Mises, *The Theory of Money And Credit, Liberty Classics Indianapolis*, 1980, pp, 95-102

৩০. ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ*, পৃ. ৭৪

নিবিড়। ফলে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এসব বিষয়ের সুষ্ঠুতা ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও মন্দা প্রতিকারে ইসলামের কৌশল সামগ্রিক, চিরন্তন ও মৌলিক। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম যেমন ব্যক্তি চরিত্রের সংশোধন ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়, তেমনি গুরুত্ব দেয় অর্থনৈতিক সংস্কারের ওপর। একইভাবে অর্থায়ন পদ্ধতি ও ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছ, প্রাকৃতিক ও বাস্তব লেনদেনকে বাধ্যতামূলক করে।

মন্দা প্রতিরোধে ইসলামের কৌশল চিরন্তন। ব্যষ্টিক (Micro) ও সামষ্টিক (Macro) পর্যায়ে ইসলামী কৌশলসমূহের সমন্বিত প্রয়োগ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের নিশ্চয়তা দেয়। উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক কৌশল ও অর্থায়ন পদ্ধতি এতোটাই সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত যে, অর্থনৈতিক মন্দার বীজাণু সেখানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

১. মন্দা প্রতিকারে ইসলামের অর্থনৈতিক কৌশল

অর্থনৈতিক অস্থিরতা মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। কৃত্রিম মুনাফা, ফটকাবাজি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ (concentration), স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত হয়ে বারবার সর্বস্বান্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক মানুষ। ইসলামী অর্থনীতি সকল ধরনের অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধের মাধ্যমে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট থাকে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মন্দা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিকারের জন্য প্রতিরোধমূলক (preventive) ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সুদ, মুনাফাখোরি, মজুতদারি, ফটকাবাজি ইত্যাদি অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণ ইসলামে নিষিদ্ধ। আর্থিক লেনদেন ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টিকারী এসব উপাদানকে পরিহার করা হলে অর্থনৈতিক মন্দা তার ডানা বিস্তারে সক্ষম হবে না।

ক. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব দর্শন আরোগ্য মলম হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংঘাত-সংঘর্ষ ও লাগামহীন প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। 'জোর যার মুল্লুক তার' ও 'শুধু যোগ্যতমেরাই টিকে থাকবে' এমন নীতির পরিবর্তে সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ, মানবিক সম্ভাবনার বিকাশ সাধন ও মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য পারস্পরিক কুরবানি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করাই ইসলামী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। ভ্রাতৃত্বের দাবি হচ্ছে– কোনো মানুষই তার ভাইকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারে না, ভাইকে বিপদে ফেলে, তাকে বঞ্চিত করে সকল কল্যাণ নিজেই ভোগ করতে পারে না। একজন মানুষ কখনই নিজেকে অন্য ভাইয়ের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মনে করতে পারে না। ভ্রাতৃত্বের দাবি অনুযায়ী একচেটিয়া কারবার, ফটকাবাজি, মজুতদারি, দুর্নীতি, ধোঁকাবাজি, সুদ ও

জুয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই সমর্থিত হতে পারে না। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'প্রতিযোগিতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎসাহিত করা যায় যতক্ষণ তা সুস্থ থাকে, দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং ইসলামের সার্বিক উদ্দেশ্য মানবকল্যাণে সহায়তা করে। যখনই তা সীমালঙ্ঘন করে, প্রতিহিংসা ও দাম্ভিকতার জন্ম দেয় এবং নৃশংসতা ও পারস্পরিক ধ্বংসের কারণ হয়, তখনই তা সংশোধন করতে হবে।'[৩১]

এক ভাই পেট ভরে খাবে আর এক ভাই না খেয়ে থাকবে ইসলামে তা সমর্থন করা হয় না। মহানবী সা. বলেন:

ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به

> যে লোক খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাতে ঘুমালো আর তার জ্ঞাতসারে তার প্রতিবেশী তার পাশেই অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটালো, সে তো আমার প্রতি ঈমানই আনেনি।[৩২]

খ. কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি

কার্যকর চাহিদার অভাবে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রি হয় না, যা অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি করে। ইসলাম সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাদের জন্য সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি করে। ইসলাম প্রত্যেকের সম্মানজনক জীবিকা ও জীবনমানের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে চায়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং আরো যা যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আধুনিক যুগে মূর্খতা দূর করার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। কেননা, মূর্খ ব্যক্তি তাৎপর্যগতভাবে মৃত। চিকিৎসা ও বিবাহের ব্যবস্থা করাও ইসলামী শরী'আহর মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেছেন, 'নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের একটি প্রধান দায়িত্ব। বায়তুল মাল হতেই এই উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া বেকারত্ব দূর হবে না। এ জন্য সরকারকে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।'[৩৩]

ড. এম. উমর চাপরা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাযম, ইমাম শাতিবী, মাওলানা মওদূদী, ইউসুফ আল কারযাভীর অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, 'গরিবদের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ মুসলিম সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব (ফরযে কিফায়া)।[৩৪]

---

৩১. চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, পৃ. ১৯৭

৩২. নুরুদ্দিন আলী ইবনে আবি বকর আল হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, অনুচ্ছেদঃ ফি মান ইয়াশবায়ু ওয়া জারুহু জায়িউন, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৮, খ. ৮, পৃ. ১৬৭

৩৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকাঃ সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৩৩

৩৪. চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, পৃ. ২০০

গ. আয়বৈষম্য হ্রাস ও সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন

ইসলাম আয়বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যাকাত ও উশর প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে। এগুলোর দ্বারা সমাজের দরিদ্র শ্রেণির হাতে নগদ অর্থ আসে। অর্থের তারল্য বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়ে এবং অর্থনৈতিক মন্দা দূর হয়। যেসব ব্যবস্থার মাধ্যমে ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয় ইসলাম সেসব বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ্ শুধু মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তাই দিতে চায় না, বরং সম্পদ ও উপার্জনের ইনসাফভিত্তিক বণ্টনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম এমনভাবে বণ্টননীতি রচনা করে যাতে 'সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।'

ড. উমর চাপরা বলেন, বেশ কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, মুসলিম সমাজে সম্পদের সমতা অপরিহার্য। নবী করিম স.-এর এক সাহাবী আবু যার্ গিফারী রা. সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন যে, এটা অর্জন করা সম্ভব, যদি ধনী লোকেরা নিজেদের প্রকৃত ব্যয় মেটানোর পর সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ তাদের কম সৌভাগ্যবান ভাইদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ব্যয় করে।[৩৫]

ঘ. অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম করা

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ছাড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট নিরসন করা যায় না। সুবিচার ছাড়া মানুষের সম্মান, আত্মসম্মান, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সাম্য সর্বোপরি মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে আইনের শাসনের ওপর। আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের বহু স্থানে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফেরত দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে।[৩৬]

এ আয়াতে 'আমানত' ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করার অর্থেই আমানত আদায় করা বুঝায়।

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণের নির্দেশ দেন।[৩৭]

---

৩৫. চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, পৃ. ২১৪

৩৬. আল কুরআন, ৪ : ৫৮

৩৭. আল কুরআন, ১৬ : ৯০

এ আয়াতে উল্লেখিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এটি শুরু হয় বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করা দিয়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শরী'আহ কতগুলো নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- সুদ, জুয়া, অর্থনৈতিক জুলুম, সম্পদ আত্মসাৎ ও মজুদ করা, ঘুষ, প্রতারণা, দুর্নীতি, ধোঁকা ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয় দূর করা। বিপরীতে ইসলামী শরী'আহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করতে উৎসাহিত করে, যাতে সমাজের সকলে সমানভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। ইসলামী শরী'আহ এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করতে চায় যেখানে কৃষকের যথার্থ মূল্যায়ন হবে, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত হবে, ব্যবসায়ীরা যুক্তিসঙ্গত মুনাফা অর্জন করতে পারবে–এমনিভাবে সকল অর্থনৈতিক পক্ষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামী শরী'আহ যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈধ সুযোগ-সুবিধা দিতে চায় তেমনি সকল প্রকার দুর্নীতি ও প্রতারণার কলা-কৌশল নির্মূল করতে চায়।

ঙ. সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা

ইসলাম এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে সকলের সামাজিক অধিকার পূরণ হবে, কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না এবং সকলের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে ইসলামী সমাজে গড়ে উঠবে সাহায্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই দাসে পরিণত করা যায় না। কোনো ব্যক্তি, এমনকি রাষ্ট্রও মানুষের এ স্বাধীনতা হরণ করে তাকে দাসে পরিণত করার অধিকার রাখে না। মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো ব্যক্তির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেউ কারো প্রভু নয়, আবার কেউ কারো দাস নয়- এটাই ইসলামের শিক্ষা। এক্ষেত্রে জীবনোপকরণের দিক থেকে শ্রেণিগত স্বভাবজাত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অধিকারের দিক থেকে সবাই সমান। ভূমি ও মহান আল্লাহ সৃষ্ট সকল উপকরণে সবার সমান অধিকার রয়েছে।

চ. দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ মানব সম্পদ

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হলো মানব সম্পদ। ইসলাম মানুষের মাঝে পেশাগত দক্ষতা ও সততা সৃষ্টি করে। একজন ইসলামী ব্যক্তি কাজকে 'ইবাদাত বলে গণ্য করে' এবং সে কাজ সম্পাদন করার যোগ্যতা অর্জন করাকে ফরয মনে করে।' এ দু'য়ের সমন্বিত ফল হলো ব্যক্তির পেশাগত ও নৈতিক মান বৃদ্ধি পাওয়া। ফলে ইসলামী ব্যক্তির দ্বারা অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে না।

ইসলামী মানুষ (Islamic Man) হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণ সর্বাধিককারী (Economic and Social Maximiser)। বিশ্বমন্দা দূরীকরণে প্রয়োজন অর্থনীতির পদ্ধতিগত সংস্কার আর যারা এ পদ্ধতিকে কার্যকর করবেন তাদের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তনও আবশ্যক। ইসলামে মানুষ শুধু নিজের কাছে, পরিবার ও রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করে না, বরং তাকে আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হয়। দ্বৈত জবাবদিহির এই অনুভূতি মানুষকে যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক আচরণ করতে প্রভাবিত করে।

ছ. খণ্ডিত নয়, সমন্বিত প্রয়াস

অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের অন্যান্য সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটি কারণ। 'অন্যান্য সব বিষয় ও শাস্ত্রের মাঝে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণকে প্রভাবশালী করার দ্বারা সাংঘাতিক বিপর্যয় ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে বাধ্য।' মানবজীবনের সকল সমস্যা যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ পূর্বক একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমেই কেবল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভব। ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রাত্যহিক ও জৈবিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

জ. সরকার কর্তৃক বাজার নিয়ন্ত্রণ

ইসলামী অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী স্বাভাবিকভাবে বাজার পরিচালিত হবে। ইমাম ইবনে তায়মিয়া তার 'আল-হিসবা ফিল ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ না হলে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কোনো শক্তিশালী অংশের অশুভ চক্রান্ত না ঘটলে রাষ্ট্র বাজার নিয়ন্ত্রণে কোন ভূমিকা রাখবে না।'[৩৮] কিন্তু ইসলামের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের সেসব কার্যাবলির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে যার দ্বারা অর্থব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যেমন হযরত উমর রা. আরোপ করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, এক ব্যক্তি কোনো এক দ্রব্যকে বাজারে প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রি করছে। তখন তিনি তাকে বললেন, 'হয়তো মূল্য বৃদ্ধি কর নতুবা বাজার ত্যাগ কর'।[৩৯]

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له في السوق' فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر' وإما أن ترفع عن سوقنا.

---

৩৮. *ইসলামী ব্যাংকিং*, আইবিবিএল, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৯

৩৯. ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, *মুয়াত্তা*, অধ্যায়ঃ আল-বুয়ূ' ফিত তিজারাত ওরাস সালাম, অনুচ্ছেদঃ আররাজুলু ইয়াশতারিশ শাইয়া আও ইয়াবিয়াহু ফায়াগবিনু আও ইউসা'য়্যিরু আলাল মুসলিমিন, ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশনস, ২০০৩, পৃ. ৪২৩, হাদীস নং- ৭৯১।

> সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব র. থেকে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব রা. হাতিব ইবনে আবি বালতাআর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন মদিনার বাজারে নিজের শুকনা আংগুর বিক্রি করছিলেন। উমার রা. তাকে বললেন, হয় মূল্য বাড়িয়ে দাও অথবা আমাদের বাজার থেকে উঠে যাও।

জোসেফ স্টিগলিটজ বলেন, 'বাজার অর্থনীতি তখনই কাজ করে যখন তা জবাবদিহি ও নিয়মনীতির অধীনে পরিচালিত হয়।'[৪০] সৎ ব্যক্তির স্বাধীন উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রের ন্যায়ানুগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব।

ঋ. ভোগবিলাস ও অপচয় পরিত্যাগ

মাত্রাতিরিক্ত ভোগবিলাস ও লাগামহীন অপচয় এক দিকে যেমন সম্পদ নষ্ট করে, অন্য দিকে তা আবার অর্থনৈতিক মন্দা ডেকে আনে। তাই ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপরতা দূর হলে মানুষ অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনের জন্য লেগে থাকবে না এবং অপচয়ের মাধ্যমে তা নষ্টও করবে না। এ জন্য ইসলাম মানুষকে ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের পরিবর্তে সহজসরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। ইসলাম ঘোষণা করে,

﴿ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا-إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾

তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না, 'নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।[৪১]
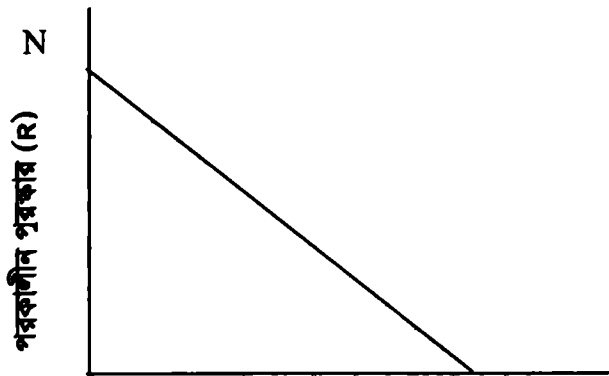
ইসলামে মানুষ পরকালে বিশ্বাস করে। Anas al-Zarqa-এর মতে, 'পরকালীন পুরস্কার ও বর্তমান ভোগের মধ্যে একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। পার্থিব অনাকাঙ্ক্ষিত ভোগ যত কম হবে, পরকালের পুরস্কারের পরিমাণ তত বেশি হবে।[৪২]

---

৪০. মেহেদী হাসান, "যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ", *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৩ অক্টোবর ২০০৮

৪১. আল কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপরতা দূর হলে মানুষ অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনের জন্য লেগে থাকবে না। অন্যায় পথে সম্পদ অর্জনের চেষ্টাই মূলত অর্থনীতিতে মন্দা সৃষ্টি করে। অতএব, অর্থনৈতিক মন্দা দূরীকরণের জন্য ইসলামের সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবনপদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঞ. ঋণের পরিবর্তে ইকুইটিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতি ইকুইটিভিত্তিক। ইসলামী অর্থনীতি ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজির চাহিদা পূরণ করে। 'এ ব্যবস্থা কারবারের মালিকানাকে বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralize) করে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয় এবং সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টনে বিরাট অবদান রাখে।'

ঋণনির্ভর আর্থিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট অবিচার, অস্থিতিশীলতা ও বাণিজ্য চক্র দূর করতে ইকুইটিভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা কতিপয় অমুসলিম অর্থনীতিবিদও করেছেন।[৪২]

ট. একচেটিয়া কারবার নিষিদ্ধ

সর্বাধিক সমাজ কল্যাণ সাধন করা ইসলামী শরী'আহর একটি উদ্দেশ্য। কাজেই যেসব উপাদান এ উদ্দেশ্যের অন্তরায় তা অবশ্যই বর্জনীয়। একচেটিয়া কারবারের মালিকগণ অতি মুনাফার আশায় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় বলে উৎপাদন কমে যায়। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতিপয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে তা শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাই একচেটিয়া কারবার অর্থনৈতিক সুবিচারের পরিপন্থী বলে ইসলামী শরী'আহতে তা সমর্থিত নয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং বিশেষ ধরনের ওষুধপত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি তত্ত্বাবধানে স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারের সাথে ইসলামের বিরোধ নেই। কারণ, এগুলো পরিচালিত হয় জনকল্যাণের জন্য। এক্ষেত্রে মুনাফা সর্বোচ্চ করাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। ইসলামী অর্থনীতিতে জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে একচেটিয়া কারবার সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে পারে।

২. অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টিকারী উপলক্ষসমূহ নিষিদ্ধকরণ

পূর্বের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, অর্থায়নের ক্ষেত্রে সুদ, জুয়া, ফটকাবাজি, অস্বচ্ছতা ইত্যাদি উপাদানের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল; যা অর্থনৈতিক মন্দাকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইসলাম এসব উপাদান দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষেধ করে। ইসলামী অর্থায়নের মূলনীতিতে চরিত্রহীন, কৃত্রিম ও অবাস্তব পন্থা-পদ্ধতি ও লেনদেন নিষিদ্ধ। সুদী লেনদেন, পণ্যের ওপর মালিকানা অর্জন ছাড়াই তা কেনাবেচা করা, ঝুঁকিপূর্ণ ও

---

৪২. ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, চট্টগ্রাম: গাউছিয়া হক মঞ্জিল, ১৯৯৮, পৃ. ৫৫

অনিশ্চিত লেনদেন, মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ নয়। অর্থায়নের ক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টিকারী এসব উপাদানকে পরিহার করা হলে অর্থনৈতিক মন্দাও ডানা বিস্তারে সক্ষম হবে না। লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামে নিষিদ্ধ চিরন্তন উপাদানগুলো হলো :

ক. ঘারার বা অনিশ্চয়তা ও প্রতারণা

ঘারার হলো কোনো ব্যবসায় অথবা ব্যবসায়িক চুক্তিতে কিংবা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। এ কারণে ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রতারণামূলক কেনাবেচাকে 'বাই আল ঘারার' বলা হয়। ঘারার বা অস্পষ্টতার কারণে ব্যবসাবাণিজ্য, স্টক ও শেয়ার বাজারে ফটকাবাজির উদ্ভব হয়। এটি দূর করা হলে ফটকাবাজি ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হবে না। ইসলামে ঘারার নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

রাসূলুল্লাহ স. ঘারার বা অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[৪৩] ব্যবসাবাণিজ্যে ইসলাম ফটকাবাজির মতো এমনসব কৌশলকে নিষিদ্ধ করেছে যার মধ্যে অতিরিক্ত অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা রয়েছে। একপক্ষ অধিক লাভবান হবে এবং অন্য পক্ষ নিঃস্ব হবে এটা ইসলামে কাম্য নয়। এ জন্য ইসলামে মুলামাসা,[৪৪] মুনাবাযা[৪৫] ইত্যাদি ফটকামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ।

খ. ফটকাকারবার

ইসলামে ফটকা কারবার নিষিদ্ধ। কারণ এটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুর্নীতির রাস্তা তৈরি করে। ফটকা কারবারীগণ সস্তায় পণ্য কিনে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে পণ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে আটক রাখে। ফলে পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করে। এ কারণে পণ্য উৎপাদনকারী কম দামে পণ্য বেচে দিতে এবং প্রকৃত খরিদ্দার বেশি দামে তা কিনতে বাধ্য হয়। মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী ফটকাকারবারীরা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে।

---

৪৩. ইমাম মালিক, *মুয়াত্তা*, বর্ণনা: ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, অধ্যায়: আল-বুয়ু ফিত তিযারাতি ওয়াস সালাম, অনুচ্ছেদ: বাই' আল ঘারার, পৃ. ৪১৬, হাদীস নং-৭৭৭

৪৪. 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' হলো জাহিলি যুগে প্রচলিত দুটি ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতি দুটির ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 'মুলামাসা' মূলত স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করা। যেমন বিক্রেতা কোনো ক্রেতাকে বলল, এই কাপড়গুলোর মধ্যে যেটি তুমি স্পর্শ করবে সেটিই তোমার কাছে বিক্রি হয়ে যাবে।

৪৫. 'মুনাবাযা' হলো নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করা। এটি এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। ইসলামপূর্ব যুগে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের অস্তিত্ব ছিল। এটি এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, যখন দরদামকৃত জিনিস আমি তোমার নিকট নিক্ষেপ করবো তখন সেটির বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং এ বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার খিয়ার বা অধিকার তোমার থাকবে না।

ফটকাকারবারের একটি বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে, 'ফরওয়ার্ড সেলিং' বা আগাম বিক্রিয়। বিক্রেতার দৃষ্টিতে যদি পণ্যের মূল্য কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সে নিজের কাছে পণ্য না থাকার পরও উৎসাহী ক্রেতার কাছে তা আগাম বিক্রি করে। পরবর্তী সময়ে পণ্যের দাম কমে গেলে বিক্রেতা বাজার থেকে পণ্য কিনে তা গ্রাহকের কাছে সরবরাহ করে। ইসলামে এ জাতীয় কেনাবেচা নিষিদ্ধ। হাকিম ইবনে হিযাম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, لا تبع ما ليس عندك 'যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করো না।'[৪৬]

গ. বাজি রাখা ও কারবারি জুয়া

মাইসির বা জুয়ার মাধ্যমে একপক্ষ অন্যায়ভাবে লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসাবাণিজ্যে জুয়ার অনুশীলন না থাকলে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকবে না। ইসলামে জুয়া খেলা নিষিদ্ধ। শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে জুয়া খেলাই নিষিদ্ধ নয়; বরং ব্যবসার নামে যেসব বাজি রাখা হয়, সেগুলোও নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। জুয়ার মাধ্যমে একপক্ষ অন্যায়ভাবে লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিনা পরিশ্রমে মুনাফা লাভের আশায় বহু মানুষ জুয়ায় অংশগ্রহণ করে শুধু সর্বস্বান্তই হয়ে পড়ে না; বরং গোটা অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়। এ ছাড়া জুয়া ও বাজি রাখা নৈতিক চরিত্রের জন্যও অত্যন্ত লজ্জাকার ও অপমানের বিষয়। এটি সমাজের মাঝে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করে এবং মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি, ন্যায়পরায়ণতা ও ভদ্রতা ধ্বংস করে ফেলে। জুয়া নিষিদ্ধ করে আল কুরআনে বলা হয়েছে;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

হে মু'মিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং এগুলো বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[৪৭]

ঘ. কেনাবেচায় ও চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহ্ বা অজ্ঞতা দূর করা

জাহালাহ্ বা অজ্ঞতাও এক ধরনের ঘারার। জাহালাহ্ হচ্ছে এমন ধরনের লেনদেন যেখানে ক্রেতা জানে না যে, সে কী ক্রয় করছে অথবা বিক্রেতা জানে না যে, সে কী বিক্রি করছে। জাহালাহ্র একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, বিক্রীত পণ্যের নির্দিষ্টতা, পণ্যের মূল্য, বিক্রয়ের সময় এবং কোথায় পণ্যটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে তা স্পষ্ট না থাকা। একইভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয়বস্তু

---

৪৬. ইমাম তিরিমিযি, *আল জামি*, অধ্যায়: ইজারা, অনুচ্ছেদ: মা জায়া ফি কারাহিয়াতি বাইয়ি মা লাইছা ইনদাহু, হাদীস নং ১২৩২

৪৭ আল কুরআন, ৫: ৯০

সুস্পষ্ট না হলে সেখানেও জাহালাহ্‌র সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামে কেনাবেচা এবং চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহ্‌কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, অনুমান করে পানির নিচের মাছ বিক্রি করা নিষিদ্ধ। কেননা, এখানে মাছের পরিমাণ অজ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر

পানির নিচের মাছ বিক্রি করো না। কেননা, এটি অনিশ্চিত বা ঘারার।[৪৮]

ঙ. মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুতদারি

মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুত করাকে ইহতিকার বা মজুতদারি বলা হয়। ফটকা কারবারী সস্তায় পণ্য কিনে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রয়ের জন্য তা মজুত করে। ফলে উৎপাদনকারী কম দামে পণ্য বিক্রি করতে এবং ক্রেতা চড়া দামে তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। যেমন, মহাজনরা ঋণের নামে টাকা সুদে টাকা দিয়ে কৃষকদের নিকট থেকে নামমাত্র দামে খাদ্যশস্য কিনে মজুত করে আবার সেই খাদ্যশস্য চড়া দামে তাদের কাছে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করে। এর পরিণতিতে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা অন্যায়ভাবে অর্থ আত্মসাতের নামান্তর। এ কারণে পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দামবাড়ানোর উদ্দেশ্যে তা মজুত করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন:

لا يحتكر الا خاطئ

অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ সংকটের সময় পণ্য মজুদ করে না।[৪৯]

চ. ঝুঁকিপূর্ণ ভবিষ্যৎ লেনদেন চুক্তি

বাই সালাম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহ অনিশ্চিত হলে ভবিষৎ লেনদেন চুক্তি বৈধ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহ না হওয়ার কারণে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে। তা ছাড়া এক্ষেত্রে বিক্রেতার দুর্বলতার সুযোগে ক্রেতা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় কম দামে পণ্য কেনে এবং বেশি দামে বেচে। এর ফলে বাজারে পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ স. ফল পাকার আগে কিংবা উঠানোর যোগ্য হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এক্ষেত্রে ফল সরবরাহের পূর্বে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আনাস রা. বলেন,

عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو .
فقلنا لأنس ما زهوها ؟ . قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك

---

৪৮. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরুত: আল মাকতাবাতু মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯, খ. ৬, পৃ. ১৯৭, হা. নং-৩৬৭৬,

৪৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-মুসাকাহ ওয়া আল-মুজারায়াত,অনুচ্ছেদ: তাহরিমুল ইহতিকার ফিল আকওয়াত, কায়রো: আল-মাকতাবাতু আল-তাওফিকিয়্যাহ, ২০০৭, খ. ১১, পৃ. ৩১, হাদীস নং-১৬০৫

নবী করিম স. ফল না পাকা পর্যন্ত এর ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ফল পেকেছে কিনা তা কিভাবে জানা যাবে? তিনি বলেন, যে পর্যন্ত লাল না হয়, এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি মনে কর যে তোমাদের ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে নিতে পারবে যদি আল্লাহ ফলগুলোর পাকা বন্ধ করে দেন।'[৫০]

ছ. বাজারের ওপর কৃত্রিম হস্তক্ষেপ

ইসলামী শরী'আহ পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখতে চায় এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে সমানভাবে লাভবান করে দিতে চায়। এক্ষেত্রে কেউ যদি বাজারের স্বাভাবিকতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে ও পণ্যের মূল্য নিয়ে খেলা করতে চায় তাহলে ইসলাম তা প্রতিরোধ করে। যেমন রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

কোনো শহরের লোক যেন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি না করে। তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের কারোর দ্বারা কাউকে রিযিক দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।[৫১]

জ. রিবা বা সুদ

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মন্দা তার বাহন হারায়। সুদ হলো অর্থনৈতিক মন্দার দ্রুতযান। অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবিচার সৃষ্টিতে সুদের জুড়ি নেই। এ কারণে ইসলাম সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে।

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাবাণিজ্যকে বৈধ করেছেন আর সুদকে করেছেন নিষিদ্ধ।[৫২]

সুদ নিষিদ্ধ করা হলে গোটা আর্থিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে ইকুইটির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এবং এর পেছনে থাকবে প্রকৃত সম্পদ (Real Asset)। সুদভিত্তিক ঋণের ব্যবস্থাকে ইক্যুইটিতে রূপান্তর করতে পারলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনেকটা সংকুচিত হবে।

ঝ. বাই আদ-দাইন বা ঋণ বিক্রি নিষিদ্ধ

ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি করাকে বাই আদ-দাইন বলে। ডিসকাউন্টিং-এর ভিত্তিতে ঋণ বিক্রি ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামী ফিক্বহ একাডেমির সকল সদস্য ঋণ বিক্রির নিষিদ্ধতাকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন।

---

৫০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ: ইযা বাআ আস সামারা কাবলা আন ইয়াবদু ওয়া সালাহুহা সুম্মা আসাবাতহু..., মিশর: মুয়াস্সাসাতু জাদ, ২০১২, খ. ১, পৃ. ৫৪৯, হাদীস নং ২১৯৮

৫১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ: তাহরিমুল বাইয়িল হাজিরি লিল বাদ, খ. ১০, পৃ. ১১৮, হাদীস নং ১৫২২

৫২. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

এ প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে:

إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي بيع الدين بالدين.

অর্থাৎ, রাসূল স. ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[৫৩]

নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে এক নজরে মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হয়েছে:
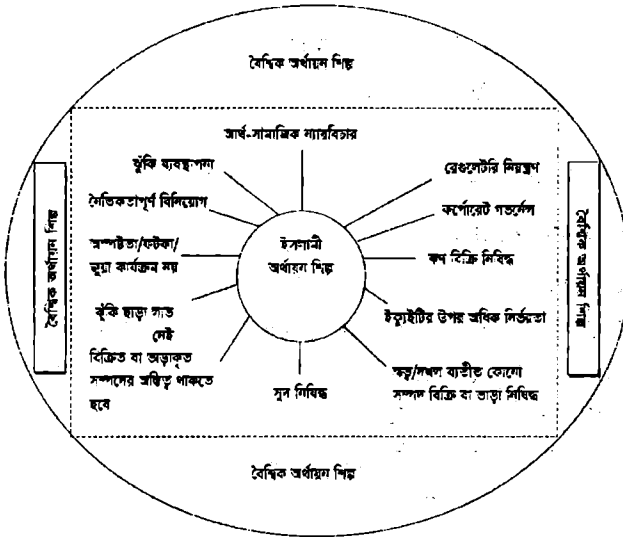
মন্দা প্রতিকারে ইসলামী ব্যাংকিং

মন্দা প্রতিকারে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল কর্মকাণ্ডে ইসলামী ব্যাংক সুদ পরিহার করে চলে বিধায় সুদের কারণে সৃষ্ট মন্দা থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে পারে। ইসলামের প্রত্যেকটি অর্থায়ন পদ্ধতি (অংশীদারি, ক্রয়বিক্রি ও ভাড়া পদ্ধতি) প্রকৃত সম্পদের ভিত্তিতে (Asset Backed) হয়ে থাকে। 'যেখানে লেনদেনে শুধুমাত্র কাগুজে হস্তান্তর ঘটে, দ্রব্য বা স্টকের বাস্তব ডেলিভারি ঘটে না, সেগুলো ইসলামী আইন অনুযায়ী সিদ্ধ নয়।' এ কারণে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করে। নিম্নে অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিকারে ইসলামী ব্যাংকের কৌশলসমূহ উল্লেখ করা হলো:

---

৫৩. তাহাবী, *শারহু মা'আনিল আছার*, অধ্যায়: আল-বুয়ূ', পরিচ্ছেদ: বাইয়ুল মুছাররাত, হা. নং: ৫১৩২

ক. অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

ইসলামী ব্যাংক অংশীদারি পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে। অর্থনৈতিক ওঠানামার ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীগণ বেশি মুনাফা করলে ব্যাংক বেশি মুনাফা পায়। ফলে আমানতকারীদের আয়ও বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে বিনিয়োগ গ্রাহকগণ লোকসান করলে ব্যাংকও তা বহন করে এবং আমনতকারীদেরকেও তা বহন করতে হয়। ফলে লাভ-লোকসানের প্রভাব গোটা অর্থনীতির ওপর পড়ে। এ কারণে কোনো বিশেষ পক্ষ অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে না।

খ. ঋণ বাজারের (Loan Market) বিলুপ্তিকরণ

ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক কেনাবেচার পরিবর্তে মুনাফার ভিত্তিতে পণ্যসামগ্রী কেনাবেচা করে ও কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ করে। ফলে উদ্ভূত অর্থ (Derivative) জনিত কারণে সৃষ্ট মন্দার হাত থেকে অর্থনীতি অনেকটা নিরাপদ হয়।

গ. বিনিয়োগ আদায় সহজতর

ইসলামী ব্যাংক গ্রাহককের নিকট মুনাফার ভিত্তিতে মাল বিক্রি করে। ফলে গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ব্যবসার পরিবর্তে অন্যত্র বিনিয়োগের অর্থ স্থানান্তর করতে পারে না। তা ছাড়া উক্ত মাল Hypothecation ও Pleadge পদ্ধতিতে ব্যাংকের জামানতে থাকে। ফলে বিনিয়োগগ্রহীতা বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক উক্ত মালামাল বিক্রি করে অর্থ আদায় করতে পারে। এ কারণে বিনিয়োগের অর্থ অনাদায়জনিত ক্ষতি থেকে ব্যাংক ও অমানতদারগণ নিরাপদ থাকে এবং সামষ্টি অর্থনীতিতে ঝুঁকি হ্রাস পায়।

ঘ. অংশীদারিত্ব ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রবর্তন

অর্থনৈতিক মন্দা দূরীকরণের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বভিত্তিক (PLS) ব্যাংকিং পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্ব মন্দা দূরীকরণে এ পদ্ধতির সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

এক. দেউলিয়া হতে রক্ষা: অংশীদারি পদ্ধতির মূলনীতি হলো, 'ঝুঁকির সাথে লাভ এবং লাভের সাথে ঝুঁকি' '(আল গুনমু বিল গুরমে আল-গুরমু বিল গুনমি الغنم بالغرم وا لغرم بالغنم)।'[৫৪] এ নীতির আলোকে অর্থায়নকারীকেও ঝুঁকি বহন করতে হয়। ফলে ঝুঁকি শুধু উদ্যোক্তার প্রতি বর্তায় না। এভাবে লক্ষ লক্ষ আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডার লোকসান গ্রহণ করলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ কমই হয়, যা বহন করা প্রত্যেকের জন্য সহজ এবং কেউ দেউলিয়া হয় না। এ জন্য ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকি বলেছেন, 'Profit

---

[৫৪] ড. আলী আহমাদ নদভী, *জামহারাতুল কাওয়ায়েদিল ফিকহিয়্যা ফিল মু'আমালাতিল মালিয়া*, খ. ১, আলরাজী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, রিয়াদ, ২০০০, পৃ. ১৮৩

Sharing will be a safeguard against bankrupcies'। অর্থাৎ মুনাফায় অংশীদারি পদ্ধতি দেউলিয়ার বিপরীতে রক্ষাকবচ।[৫৫]

দুই. ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে বিনিয়োগ: সকল অংশীদার পুঁজি সরবারাহ করে বলে বড় ধরনের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্ভব হয়।

তিন. দক্ষতাপূর্ণ বিনিয়োগ বরাদ্দকরণ: ইসলামী ব্যাংক অংশীদারি পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে বলে বিনিয়োগগ্রাহকের দক্ষতা ও কারবারের উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করতে হয়। ফলে অনুৎপাদনশীল ও বিলাসিতামূলক খাতে বিনিয়োগের অর্থ ব্যবহারের সুযোগ থাকে না।

ইসলামের এই অংশীদারি অর্থায়ন পদ্ধতি পুরো অর্থব্যবস্থাকে মজবুতি (Substantially) ও স্থিতিশীল অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং অর্থনৈতিক মন্দা দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। 'যদি আর্থিক পুঁজির ওপর সুদের পরিবর্তে মুনাফার অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা চালু করা যায়, তবে পুঁজি বিনিয়োগ আরো বেশি শক্তিশালী হবে।'[৫৬]

"আর্থিক সংকট থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। ভালো ব্যবস্থাপনা ও যুক্তিযুক্ত তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করে 'ইকোনোমিস্ট' বলেছে, পাশ্চাত্য আধুনিক যুগেও ইসলামের কাছ থেকে ইক্যুইটি ব্যাংক বা অংশীদারিত্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।"[৫৭]

ঙ. বাস্তব লেনদেন (Real Transaction) পদ্ধতির প্রবর্তন

সুদের বিনিময়ে ঋণের আদান-প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ। অর্থ ঋণ দিয়ে কৃত্রিম উৎপাদন সৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত লেনদেন ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম কেনাবেচা পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। কেনাবেচা পদ্ধতি অনুশীলনে প্রতিটি লেনদেন হয় বস্তুনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল। যে কারণে সমাজে কৃত্রিম অর্থ সৃষ্টির সুযোগ অনেকটা কমে যায় এবং আর্থিক মন্দা ও অস্থিতিশীলতার কবল থেকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পদ নিরাপদ হয়।

---

৫৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, "ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব", *দৈনিক সংগ্রাম*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই ২০০৪

৫৬. আবদুল হালিম এম. বশির, "ইক্যুইট অংশগ্রহণ চুক্তি ও বিনিয়োগ: তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ফলাফল", *ইসলামী ব্যাংকিং*, আইবিবিএল, জানুয়ারি-জুন ২০০৮

৫৭. শাহ আব্দুল হান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি: দর্শন ও কর্মকৌশল*, ঢাকা: আল আমিন প্রকাশন, ২০০২, পৃ. ৪৯

শর'ঈ নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে যথার্থভাবে কেনাবেচা পদ্ধতির অনুশীলন করা হলে তা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রচলিত সুদভিত্তিক ঋণ পদ্ধতির চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

সুদভিত্তিক ঋণদান পদ্ধতিতে অর্থকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে ঋণের সাথে বাস্তবে সম্পদের কোনো সম্পর্ক থাকে না, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্তরায়। এমনকি কোনো ব্যবসায়ী যদি পণ্যের ব্যবসার জন্যও ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়, তবুও ব্যাংকের সাথে পণ্যের সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকে না। বিষয়টি নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে:
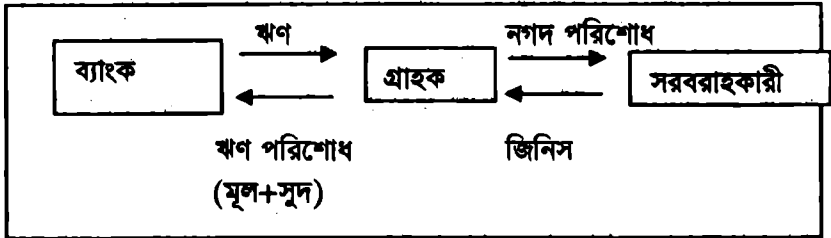
সুদভিত্তিক ঋণদান পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকের কেনাবেচা পদ্ধতির প্রত্যেকটি লেনদেন প্রকৃত সম্পদের ভিত্তিতে (asset backed) হয়ে থাকে। এখানে শুধু দ্রব্যের কাগজে হস্তান্তর ঘটে না; বরং প্রতিটি লেনদেন হয় প্রকৃত দ্রব্যের বাস্তব ডেলিভারির ভিত্তিতে। ফলে ইসলামী ব্যাংকের কেনাবেচা পদ্ধতির বিনিয়োগও অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা অর্জন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই বাস্তবতার নিরিখেও এটি অর্থনীতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। বিষয়টি নিচের চিত্রে দেখানো হলো:
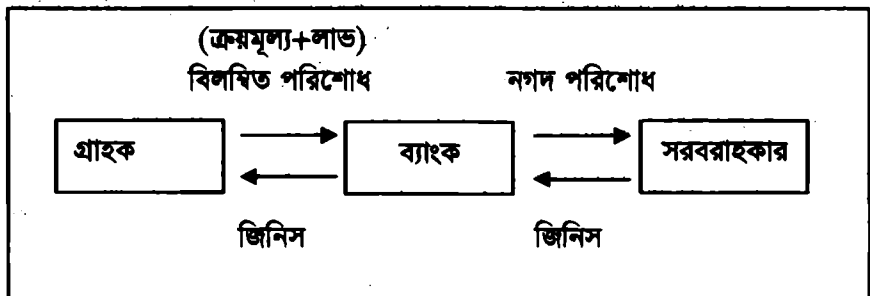
ইসলামী ব্যাংকের কেনাবেচা পদ্ধতির বিনিয়োগ

কেনাবেচার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ এমন কতগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, যা অনুসরণ করা হলে অর্থনীতিকে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক দিকসমূহ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব। কেনাবেচা পদ্ধতির অনুশীলনে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি লেনদেন হয় বস্তুনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল। ফলে এটি আর্থিক মন্দার হাত থেকে অর্থনীতিকে সুরক্ষা দিতে পারে। একটি সহীহ বা বিশুদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের শর্তাবলি নিম্নরূপ:

এক. পণ্য বিক্রেতার অধিকারে আসার পূর্বে তা বিক্রি করা বৈধ নয়।

দুই. বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় পণ্য নষ্ট হলে এর দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

তিন. বিক্রীত পণ্য অবশ্যই বাস্তব হতে হবে, কাল্পনিক কিংবা কৃত্রিম হওয়া যাবে না।

চার. লেনদেন অবশ্যই প্রকৃত (genuine) হতে হবে এবং পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে হতে হবে।

পাঁচ. অস্তিত্বহীন, অজ্ঞাত ও হস্তান্তর অযোগ্য বস্তু কেনাবেচা নিষিদ্ধ।

ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত শর্তাবলি পরিপালিত হলে অর্থনীতি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোনো ধরনের আর্থিক সঙ্কটই অর্থনীতিকে সহজে দুর্বল করতে পারে না।

চ. কল মানিমার্কেটের পরিবর্তে মুদারাবা মানিমার্কেট গঠন

ইসলামী ব্যাংক কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ করে না। ফলে তারল্য সঙ্কটে পতিত ব্যাংককে উচ্চ সুদের হারে ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে মুদারাবারার ভিত্তিতে ফান্ড সরবরাহ করে। এ কারণে সাময়িক অর্থ সঙ্কটে পতিতে ব্যাংককে অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেউলিয়ার কবল থেকে উদ্ধার করে।

ছ. আর্থিক দলিলপত্র (Financial Instrument)

ইসলামে আর্থিক দলিলপত্র কেবল প্রকৃত সম্পদ (Real Asset)-এর বিপরীতে ইস্যু করা যায়। প্রতিটি লেনদেনের পেছনে প্রকৃত সম্পদ যথাযথভাবে ভূমিকা পালন করে বলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত হয় না।

উপসংহার

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর রয়েছে উন্নততর অর্থনৈতিক দর্শন। ইসলামী অর্থনীতিতে যে কৌশল রয়েছে তা স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার জন্য খুবই সহায়ক। এ সকল উপাদান সম্মিলিতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব

অর্থনৈতিক মন্দা দূর করা সম্ভব। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় অতিক্রম করছে ইসলামী ব্যাংকিং। এর শ্রেষ্ঠত্ব, দক্ষতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও কল্যাণকামিতা আজ দিবালোকের ন্যায় বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত আর্থিক কাঠামো দীর্ঘ সময়ব্যাপী অস্তিত্বশীল থাকার কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসলামের আর্থিক কৌশলসমূহ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না। তবে ইসলামের যেসব পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যেগুলো বিশ্বমানের আর্থিক পদ্ধতি গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করে সেগুলো তারা গ্রহণ করতে পারে। এ লক্ষ্যে কিছু পরামর্শ নিম্নে প্রদান করা হলো :

১. মোট অর্থায়নে ইক্যুইটি (equity) বৃদ্ধিকরণ এবং ঋণের ক্ষেত্র হ্রাস করণ।

২. ঋণ বিস্তৃতকরণে ক্ষেত্রে রিয়াল সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান, যাতে জুয়া ও ফটকাবাজি উৎসাহিত না হয়।

৩. ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য বিবেচনা করা এবং তত্ত্বাবধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

৪. সিকিউরিটি ইস্যুর ক্ষেত্রে এর গুণাগুণের ব্যাপারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা উচিত। যাতে ক্রেতারা জানতে পারে যে, তারা কি ক্রয় করছে।

৫. আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সচল ও ঝুঁকিমুক্ত রাখতে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৬. মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারের পরিবর্তে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬

হাদীসের আলোকে শর‘ঈ বিধি-বিধান নিরূপণে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদান : মূল্যায়ন

ড. মো. মিজানুর রহমান*

Contribution of Sheikh Nasiruddin Al-Albani in Deriving *Sharī'ah* Ruling based on Hadith: An Evaluation

ABSTRACT

Sunnah or Hadith is the second source of the sharī'ah. Islamic jurists analyzed this source in extracting and introducing legal decisions. Alongside the Fuqahā' (Jurists) the Muhaddis (experts of Hadith) also exerted tremendous efforts in finding and extracting legal decisions, although the Muhaddis study within the scope of Hadith, collecting Hadith, managing compilation, scrutinizing the chain of narration and accuracy of the text. Sheikh Nasiruddin al-Albani (1914-1999 AD) was one of those who studied vigorously the application of Hadith in deriving sharī'ah ruling. Along with compilation of Hadith, illustration, scrutinizing text and chain of narration, he also played a vital role in deriving sharī'ah ruling in the light of Hadith. He authored many worthy books in this field too on top of that he was also a great scholar of Hadith. This paper presents his invaluable contribution in deriving sharī'ah ruling. Narrative method was applied in writing this paper. Many documents including the Quranic text and Hadith and major books in this field were also referred. The current paper ultimately evaluates the huge contribution of Sheikh Nasiruddin al-Albani in the field of sharī'ah ruling.

Keywords: Sheikh al-Albani; deriving sharī'ah ruling; Hadith; Muhaddis, Fuqaha.

---

* সহকারী অধ্যাপক, জেনারেল এডুকেশন বিভাগ (ইসলাম শিক্ষা), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মানিকনগর, ঢাকা

সারসংক্ষেপ

সুন্নাহ বা হাদীস শরঈ' বিধি-বিধানের দ্বিতীয় উৎস। ফকীহগণ শর'ঈ বিধান উদ্ভাবনে এ উৎসকে প্রয়োগ করেছেন। ফকীহগণের পাশাপাশি যুগে যুগে অনেক মুহাদ্দিসও শর'ঈ বিধান বর্ণনা ও নিরূপণের প্রয়াস নিয়েছেন, যদিও মুহাদ্দিসগণ মূলত হাদীস নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, হাদীসের সনদ-মতন যাচাই-বাছাই-এর নীতিমালা নির্ধারণ, হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। যেসব মুহাদ্দিস তাঁদের মূল কর্তব্যের পাশাপাশি হাদীসের আলোকে শরীয়তের বিধি-বিধান নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁদের অন্যতম শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (১৯১৪-১৯৯ খ্রি.)। হাদীসের সংকলন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সনদ-মতন যাচাই-বাছাই এর মূলনীতি নির্ধারণের পাশাপাশি তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থসমূহে তিনি হাদীসের আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে সবিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ইলম হাদীসে অনবদ্য অবদানের পাশাপাশি এ মহান মনীষী হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সে সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কুরআন, হাদীস এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট মৌলিক গ্রন্থাবলি তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. কেবল ইলম হাদীসের উপর গবেষণা করেননি; বরং তিনি শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়েও যে বিশাল অবদান রেখেছেন, এ প্রবন্ধ তার-ই স্বাক্ষর বহন করবে।

মূলশব্দ: শায়খ আলবানী; শরঈ বিধান নিরূপণ; হাদীস; মুহাদ্দিস; ফকীহ

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। এর মৌলিক উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামের অনুসারীদেরকে কুরআন ও হাদীস গুরুত্বের সাথে মেনে চলতে হয়। কেননা এটি কুরআনের নির্দেশ।[১] হাদীস মূলত পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা[২] ও এর প্রায়োগিক রূপ। যা মহানবীর স. কথা, কর্ম ও মৌন সমর্থনের মাধ্যমে উপস্থাপিত। অতএব, হাদীস কেবল জ্ঞানগত চর্চার বিষয় নয়; বরং একটি প্রায়োগিক বিষয়ও। এ কারণে হাদীসের অর্থ, মর্মার্থ ও হাদীসে বিধৃত শর'ঈ বিধি-বিধান অনুধাবন

---

১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রসূলের। আল-কুরআন, ৪ : ৫৯। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা। আল-কুরআন, ৬৪ : ১২

২. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ আমরা আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন, যাতে তারা চিন্তা করে। আল-কুরআন, ১৬ : ৪৪

অত্যাবশ্যক। তাছাড়া যুগ সমস্যার সমাধানে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ও অতি প্রয়োজন। যার তাগিদেই যুগে যুগে আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী আইন বিশারদগণ হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয় করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস আল্লামা শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. হাদীসের আলোকে মানব জীবন ও জীবনাচরণের নানাবিধ প্রসঙ্গে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ের প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিশ্বখ্যাত সহীহ ও দঈফ হাদীসের সংকলন, হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইসলামের বহুবিধ বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহে এর প্রমাণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর পরিচয়

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ আল-আলবানীর রহ. প্রকৃত নাম মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন।[৩] তাঁর কুনিয়ত বা উপনাম আবূ 'আব্দির রহমান। উপাধি আল-আলবানী। তিনি ১৯১৪ খ্রি. মোতাবেক ১৩৩২ হি. সনে তৎকালীন ইউরোপের আলবেনিয়ার অন্তর্গত 'আশকূদারাহ' নগরীতে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে আল-আলবানী উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং এ কারণে তিনি শায়খ আল-আলবানী হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পিতা শায়খ নূহ ইবন আদম ইবন নাজাতী আল-আলবানী। যিনি উসমানীয় খিলাফতের রাজধানী আস্তানায় (বর্তমান ইস্তাম্বুল) একটি ধর্মীয় শিক্ষালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে নিজ এলাকায় ফিরে এসে দীনী জ্ঞান বিতরণে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে উসমানীয় খিলাফতের পতন এবং কামাল আতাতুর্ক-এর ক্ষমতা দখলের ফলে গোটা তুরস্কে ধর্মীয় অঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। ফলে অনেক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার আলবেনিয়া থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হিজরত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শায়খ আল-আলবানীর পিতা পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং দামিশকে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন।[৫]

---

৩. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিফাতু সালাতিন নবী*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৬; আবূ হাফস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন ইবরাহীম আল-আছারী, *ইমাত্বতুল লিছাম বি সীরাতে শায়খিনাল ইমাম মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী*, আল জীযাহ, ১৪২২ হি./ ২০০১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৬৬

৪. আবূ আসমা 'আত্বিয়্যাহ ইবন সিদকী আলী সালেম উদাহ আল-মিসরী, *সাফাহাতুন বায়দা মিন হায়াতিল ইমাম মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী ওয়া ম'আহু ক্বাতফুহু ছিমার*, কায়রোঃ দারুল আছার, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ২৬; আবদুল মতিন সালাফী, *মুহাদ্দিছুল আছর আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী*, বিহারঃ তাওহীদ ইজুকেশন ট্রাস্ট, কিশানগঞ্জ, তাবি, পৃ. ১৩

৫. ইবরাহীম মুহাম্মদ আলী, *মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী*, দামিশকঃ দারুল কলম, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ১৬-২১; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণঃ প্রকৃতি ও পদ্ধতি*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি, পৃ. ১৮২

শায়খ আল-আলবানীর পিতা যখন সিরিয়ায় হিজরত করেন, তখন বালক আল-আলবানীর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর। এরপর পিতা তাঁকে 'জামিয়াতুল ইস'আফ আল-খায়রিয়্যাহ' মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে উক্ত মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি পিতার নিকট কুরআন, তাজবীদ, নাহু, সারফ এবং ফিকহ শিক্ষা করেন।[৬] এরপর সিরিয়ার তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ২০ বছর বয়সে হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালীন মিসরের প্রথিতযশা আলিম সাইয়্যেদ রশীদ রিযার 'মাজাল্লাতুল মানার' পড়ে তিনি হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন।[৭] জ্ঞানানুশীলনের অদম্য স্পৃহা তাঁকে হাদীসবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয় জানতে উদ্বুদ্ধ করে। কঠোর অধ্যাবসায় এবং নিরন্তর সাধনার বিনিময়ে তিনি মহানবীর স. সুন্নাহের অমিয় সুধা পান করেন। সুন্নাহের এমন কোন দিক নেই, যা তিনি উপলব্ধি করেননি। সুন্নাহের লালন ও কর্ষণে তিনি ব্যয় করেছেন তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্ত। ফলে তিনি আধুনিক বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিস হিসেবে আবির্ভূত হন। সমকালীন সকল মুহাদ্দিস হাদীস বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি, পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন। সৌদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায রহ. বলেন:

لا أعلم تحت الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر الدين في علم الحديث

অর্থাৎ বর্তমান যুগে এ নভোমণ্ডলের নিচে ইলমুল হাদীসে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী অপেক্ষা অধিক পারদর্শী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।[৮] শায়খ আল-আলবানী ছিলেন একজন উঁচুমানের হাদীসবিজ্ঞানী। হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা সর্বজন স্বীকৃত।

শায়খ আল-আলবানী'র রহ. জীবন ছিল বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডে মুখরিত। জীবনের প্রাথমিক দিকে পারিবারের আর্থিক প্রয়োজনে তিনি কাঠমিস্ত্রী ও ঘড়ি মেরামতের কাজ করেন। এভাবে শায়খ আল-আলবানীর কর্মজীবন শুরু হলেও পরবর্তীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কঠোর অধ্যয়ন ও সাধনার মাধ্যমে তিনি নিজেকে জ্ঞানের জগতে সুউচ্চ মর্গে উন্নীত করেন। ইলমে হাদীসে অর্জন করেন বিশেষ পাণ্ডিত্য। ফলে কর্মজীবনের পুরো চিত্রই পাল্টে যায়। এ মহান মনীষী পরবর্তীতে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন বহুদিন। বিশ্বময় জ্ঞান বিতরণ ও ইসলামী দা'ওয়াহ প্রদানই হয়ে উঠে তাঁর প্রধান কাজ।

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৭. আশ-শায়বানী, *হায়াতুল আলবানী*, খ. ১, পৃ. ৪০১; বেলাল হোসেন, হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপন, পৃ. ১৮৩

৮. জুনায়দ, *আল-আলবানী আল-ইমাম*, পৃ. ৬-৭; বেলাল হোসেন, হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপন

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত শায়খ আল-আলবানী গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, ইলম হাদীসের দরস দান ও দা'ওয়াহ প্রদানের কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

শায়খ আল-আলবানী ইলম হাদীসের পণ্ডিত হিসেবে একদিকে যেমন সহীহ ও দঈফ হাদীস নিরূপণ করেছেন, অন্যদিকে তিনি বহু হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি শর'ঈ বিধি-বিধানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোকপাত করেন। ফলে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়েও তাঁর অবদান কম নয়। এ মহান মনীষী ১৯৯৯ সালের ২ অক্টোবর মোতাবেক ১৪২০ হিজরী ২৩ জুমাদাল আখিরাহ শনিবার দিন আসরের পর মাগরিবের কিছুক্ষণ আগে স্থানীয় সময় সাড়ে চারটায় জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ হাসপাতাল আশ-শামিসীয়াতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়ে ছিল ৮০ বছর।[৯] মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নিরূপণের স্বরূপ

সাধারণত শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয় ও এ সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে 'ফিকহ' (فقه) বলা হয়। 'ফিকহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বিষয় অনুধাবন, বোঝা ও মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। ব্যাপকার্থে আকীদা, আহকাম, আখলাক তথা ইসলামের যাবতীয় বিষয়াদি বোঝা ও হৃদয়ঙ্গম করাই হলো 'ফিকহ'।[১০] ইমাম আবূ হানীফা র. আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে এর নামকরণ করেন 'আল-ফিকহুল আকবর' (الفقه الأكبر) হিসেবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আকীদার বিষয়সমূহকে 'ইলমুল কালাম' বা 'ইলমুত তওহীদ' নামে আলাদা করা হয়। আর আহকাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ 'ফিকহ' নামে পরিচিতি লাভ করে। 'ফিকহ'-এর সংজ্ঞায় বর্তমান বিশ্বের ওলামাদের বক্তব্যে এমনটিই প্রমাণিত হয়। 'ফিকহ'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়:

العلم بالأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية

> বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শর'ঈ বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে 'ফিকহ' বলা হয়।[১১]

---

৯. আল-মিসরী, সাফাহাতুন বায়দা, পৃ. ৯৬

১০. পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ليتفقهوا في الدين -অর্থাৎ তাদের দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা উচিত। আল-কুরআন, ৯ : ১২২। মহানবী স. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. কে উদ্দেশ্য করে বলেন, اللهم فقهه في الدين -অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাকে দীন সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য দান কর।-সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, বাবু যিকরি ইবন আব্বাস; ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী ফি শরহিল বুখারী*, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি., খ. ৭, পৃ. ১০০; কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল ইসলামী, ১৯৯৫ খ্রি. /১৪১৫ হি., খ. ১, পৃ. ৩৩

১১. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কিলআজী ও ড. হামিদ সাদিক কুনাইবী, *মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়া উলূমি ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৪ হি., পৃ. ৩৪৮-৩৪৯

অপরদিকে হাদীসের বাক্যগত মর্মার্থ, ভাবার্থ অনুধাবন এবং হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়কে 'ফিকহুল হাদীস' হিসেবে অভিহিত করা হয়। যুগ যুগে হাদীসবিশারদগণ একদিকে হাদীসের শব্দার্থ ও মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেছেন, সেইসাথে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধানও নির্ণয় করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম মাজদুদ্দীন আব্দুস সালাম ইবন তাইমিয়াহ (মৃত ৬৫২ হি.) রচিত মুন্তাকাল আখবার মিন আহাদীসি সায়্যিদিল আখয়ার' (منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيار) -এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নায়লুল আওত্বার' (نيل الأوطار) এর কথা উল্লেখযোগ্য। যা রচনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আশ-শওকানী (মৃত ১২৫৫ হি.)। তাছাড়া শায়খ ইবন দুয়ান (মৃত ১৩৫৩ হি.) রচিত 'মানারুস সাবীল ফী শরহি দলীলিত তালিব' (منار السبيل في شرح دليل الطالب) গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক যুগের হাদীসবিশারদ হিসেবে শায়খ আল-আলবানীর রহ. অবস্থান ব্যতিক্রম নয়। তিনিও হাদীসের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের শর'ঈ বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। শায়খ আল-আলবানী রহ. তাঁর এ ধরনের কাজকে 'ফিকহ' বলে অভিহিত করেন। যে কারণে তিনি তাঁর সহীহ হাদীস সংকলনটির নামকরণ করেন 'সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা' (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها وفوائدها) হিসেবে। উক্ত গ্রন্থে 'ফিকহ' শব্দটির প্রয়োগ বা ব্যবহার এ জন্যেই যে, এতে হাদীসের আলোকে শরী'আতের বহু বিধি-বিধান বিধৃত হয়েছে।

হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে শায়খ আল-আলবানীর রহ. অবদান

বিভিন্ন হাদীসের উৎস ও সনদ যাচাই-বাছাই, সনদের মান নির্ণয়পূর্বক হাদীসের হুকম বর্ণনা এবং সহীহ ও দঈফ হাদীস পৃথকীকরণ- এসব কাজে ব্যাপক অবদানের জন্য শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. সমধিক পরিচিত। তবে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়েও শায়খ আল-আলবানীর রহ. অবদান কোন অংশেই কম নয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বৈচিত্র্যময় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক. হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা

হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে শায়খ আল-আলবানী প্রচুর সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। বিশেষত তিনি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বহুল আলোচিত কোন বিষয় নিয়ে হাদীসের আলোকে মাসআলা বা ফতওয়া প্রদান করে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন এবং এসব গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৃঢ়তার সাথে তাঁর মতামত ও অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।

আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়ের বিধি-বিধান সম্বলিত গ্রন্থসমূহ

এক. 'আত-তাওয়াস্‌সুল: আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু' (التوسل: أنواعه وأحكامه)। এ গ্রন্থে কুরআন-হাদীসের আলোকে বিভিন্ন ধরনের ওসীলা গ্রহণের বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। দুই. 'ফিতনাতুত তাকফীর' (فتنة التكفير)। এটি ১৭ পৃষ্ঠার

একটি ছোট পুস্তিকা। অতীতে খারিজীরা যেমনিভাবে কথায় কথায় কুফরী ফতওয়া দিয়ে দিত, বর্তমান সময়েও কোন কোন ব্যক্তি ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীরভাবে পর্যালোচনা না করেই কুফরী ফতওয়া দিতে তৎপর। এর প্রতিবাদে শায়খ আল-আলবানী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের যথার্থ অবস্থান ও সঠিক দায়িত্ব কি হবে তা কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। তিন. 'কিস্‌সাতুল মাসীহিদ দাজ্জাল' (قصة المسيح الدجال)। এ গ্রন্থটিতে কিয়ামতের পূর্বে আগমনকারী দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চার. 'আহাদীসুল ইসরা ওয়াল মি'রাজ' (أحاديث الإسراء والمعراج)। এটি ১৯০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ। এটি মূলত মহানবীর স. বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মাকদিসে ভ্রমণ এবং বায়তুল মাকদিস থেকে আসমানে আরোহণ তথা মি'রাজ সম্পর্কিত কতিপয় হাদীসের সংকলনধর্মী একটি গ্রন্থ। পাঁচ. 'মুখতাসারুল উলু'বী লিল আলিয়্যিল 'আযিম লিয-যাহাবী' (مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي)। আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রচিত এ গ্রন্থটির সংক্ষেপণ ও তাখরীজ করেন শায়খ আল-আলবানী। ফলে এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে রূপ নেয়। ছয়. 'আর-রদ্দু 'আলা কিতাবি যাহিরাতিল ইরজা লি সাফার আল হাওয়ালী' (الرد على كتاب ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي)। সাফার আল-হাওয়ালী মুরজিয়া ফিরকার আকীদা প্রচার ও প্রসারের মানসে 'যাহিরাতুল ইরজা' গ্রন্থটি রচনা করেন। শায়খ আল-আলবানী এর প্রতিবাদে 'আর-রদ্দু 'আলা কিতাবি যাহিরাতিল ইরজা' গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে কুরআন-হাদীসের আলোকে মুরজিয়া ফিরকার বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের অসারতা তুলে ধরেছেন।

ইসলামী জীবন আচরণ ও তার ফিকহী বিধান বিষয়ক গ্রন্থসমূহ

মুসলিম উম্মাহ তাদের বাস্তব কর্মজীবনে শর'ঈ বিধি-বিধান তথা কুরআন-হাদীসের মূলধারা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে মুসলিম উম্মাহর জীবন আচরণে সৃষ্টি হয়েছে মতদ্বৈততা ও নানাবিধ বিভক্তি-বিভাজন। কুরআন-হাদীসের মূলধারা থেকে মুসলিম উম্মাহ ক্রমশ দূরে চলে যাওয়ার কারণে তাদের মাঝে ইসলামের মৌলিক ইবাদাহ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ অন্যান্য জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয় যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ, পর্দা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও শর'ঈ বিধি-বিধানের নানান দৃষ্টিভঙ্গি জন্মলাভ করেছে। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. এ সমস্যাটি যথাযথভাবে অনুভব করেন এবং তা নিরসনে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে দূরত্ব দূরীকরণ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়ে উম্মাহকে কুরআন-হাদীসের মূলধারায় ফিরেয়ে আনার প্রয়াসে উপরোক্ত বিষয়সমূহ নির্বাচন করে হাদীসের আলোকে বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এক. 'তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদা' (تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجد)। গ্রন্থটিতে কবরস্থানে নামায বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে

হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। দুই. 'আদাবুয্ যিফাফ ফিস সুন্নাতিল মুতাহ্হারাহ' (آداب الزفاف في السنة المطهرة) । গ্রন্থটিতে বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহ উত্তর বাসর রাতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার ও বিবাহকেন্দ্রিক নানাবিধ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের আলোকে চমৎকারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তিন. 'আল আয়াত ওয়াল আহাদীস ফি যাম্মিল বিদ'আহ' (الأيات والأحاديث في ذم البدعة) । বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণতি সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। চার. 'আহাদীসুল বায়'ঈ ওয়া আসারুহু' (أحاديث البيع وآثاره) । গ্রন্থটিতে হাদীসের আলোকে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচ. 'আহাদীসুত তাহাররী ওয়াল বিনা 'আলাল ইয়াকীন 'আলাস সালাহ' (أحاديث التحري والبناء على اليقين على الصلواة) । ছয়. 'আহকামুল জানায়েয ওয়া বিদ'উহা' (أحكام الجنائز وبدعها) । গ্রন্থটিতে মৃত ব্যক্তির জানাযা, কাফন-দাফন, তার জন্য দু'আ ও স্মৃতিচারণ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। সাত. 'আহকামুর রিকায' (أحكام الركاز) । গ্রন্থটিতে গুপ্ত ধনের বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আট. 'ইযালাতুশ শুকূক 'আন হাদীসিল বুরূক' (إزالة الشكوك عن حديث البروك) । গ্রন্থটিতে সিজদায় উটের মত বসা সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপারে বিদ্যমান সন্দেহ-সংশয় অপনোদন করা হয়েছে। নয়. 'আল-আজভিবাতুন নাফি'আহ 'আন আসইলাতি মাসজিদিল জামি'আহ' (الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة) । গ্রন্থটি শায়খ আল-আলবানী দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে অনুষ্ঠিত দরসে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তা সংকলন করা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। দশ. 'তাসহীহু হাদীসি ইফতারিস সায়িম কাবলা সাফারিহি বা'দাল ফাজরি ওয়ার রদ্দু 'আলা মান দ'আফাহু (تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر) । গ্রন্থটিতে (সফরে ইচ্ছুক) রোযাদারের ফাজরের পর সফরে বের হওয়ার পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলা সংক্রান্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা হয়েছে এবং যারা এ হাদীসকে দঈফ বলে মনে করেন তার জবাব দেয়া হয়েছে। এগার. 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমা' (حجاب المرءة المسلمة) । বার. 'সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি স.' (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) । গ্রন্থটিতে হাদীসে নববীর আলোকে সালাতের স্বরূপ নির্ধারণে একটি স্বার্থক প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মহানবী স. যেভাবে সালাত আদায় করতেন, ধারাবাহিকভাবে তারই একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। তের. 'তামামুন নুসাহি ফি আহকামিল মাসহি' (تمام النصح في أحكام المسح) । মাসেহ সম্পর্কিত বিধি-বিধান সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ নসীহত। চৌদ্দ. 'আত-তামহীদু লি ফারদি রামাদান' (التمهيد لفرض رمضان) । পনের. 'জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ' (جلباب المرءة المسلمة في الكتاب والسنة) । কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে জিলবাব বা পর্দা প্রথা তথা মুসলিম নারীদের

পোষাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। ষোল. 'জাওয়াব হাওলাল আযানি ওয়া সুন্নাতিল জুম'আতি' (جواب حول الأذان وسنة الجمعة)। সতের. 'হিজ্জাতুন নাবিয়্যি স.' (حجة النبي صلى الله عليه وسلم)। আঠার. 'হুকমু তারিকিস সালাত' (حكم تارك الصلواة)। গ্রন্থটিতে সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ. 'ফিকহুল ওয়াকিঈ' (فقه الواقع)। বিশ. 'সালাতুল ইসতিসকা' (صلاة الإستسقاء)। গ্রন্থটিতে ইসতিসকার সালাত ও এর নিয়ম সম্পর্কে শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। একুশ. 'সালাতুত তারাবীহ' (صلاة التراويح)। গ্রন্থটিতে তারাবীহ সালাতের গুরুত্ব ও নিয়ম সম্পর্কে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। বাইশ. 'সালাতুল ঈদাইন ফিল মুসল্লা' (صلاة العيدين في المصلى)। গ্রন্থটিতে দুই ঈদের সালাত (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) ঈদগাহে পড়ার গুরুত্ব ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তেইশ. 'সালাতুল কুসূফ' (صلاة الكسوف)। গ্রন্থে সালাতুল কুসূফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চব্বিশ. 'ফতওয়া হুকমি তাতাব্বুঈ আছারিল আম্বিয়া ওয়াস সালেহীন' (فتوى حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين)। পঁচিশ. 'কামূসুল বিদ'আহ' (قاموس البدعة)। ছাব্বিশ. 'কিয়ামু রামাদান' (قيام رمضان)। গ্রন্থটিতে রামযান মাসের গুরুত্ব ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাতাশ. 'আল-লিহিয়্যিাতু ফি নাযরিদ দীন' (اللحية في نظر الدين)। শরী'আতের দৃষ্টিতে দাড়ি রাখার বিধান আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। আটাশ. 'আল-মাহউ ওয়াল ইছবাতুল লাযি য়ূদ'আ বিহি ফি লায়লাতিন নিসফি মিন শা'বান' (المحو والإثبات الذي يدعى به في ليلة النصف من شعبان), উনত্রিশ. 'মানাসিকুল হাজ্জি ওয়াল 'উমরাতি ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়া আছারিস সালাফ' (مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثارالسلف)। হজ্জ ও ওমরার বিধান সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। ত্রিশ. 'আহকামুল জুমু'আহ' (أحكام الجمعة)। গ্রন্থটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জুমু'আ সালাতের গুরুত্ব ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একত্রিশ. 'হাকীকাতুস সিয়াম' (حقيقة الصيام) সিয়ামের মর্মকথা ইত্যাদি।

এ পর্যায়ে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিশদ বর্ণনা সম্বলিত শায়খ আল-আলবানী রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো:

আত-তাওয়াস্‌সুল : আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু

'আত-তাওয়াসসুল: আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু' (التوسل: أنواعه وأحكامه) কুরআন-হাদীসের আলোকে আকীদা বিষয়ে শায়খ আল-আলবানী রচিত একটি চমৎকার গ্রন্থ। ১৩৯২ হিজরী সনে দামিশক শহরে ইয়ারমুক ক্যাম্পে নিজ বাড়িতে মুসলিম যুবকদের সমাবেশে শায়খ আলবানী আকীদা বিষয়ে দুটি দরস প্রদান করেছিলেন। সে দরসে তিনি তাওয়াসসুল বা ওসীলা সম্পর্কে গবেষণাধর্মী এক

আলোচনার অবতারণা করেন। বর্তমান গ্রন্থটি মূলত সেই আলোচনারই সংকলন। ১৫৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি ৪টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রথম অনুচ্ছেদে কুরআন-হাদীসের আলোকে তাওয়াস্‌সুল বা ওসীলাহ শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি তাওয়াস্‌সুলের শ্রেণি বিন্যাস বর্ণনা করেন। তিনি তাওয়াস্‌সুলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ সৃষ্টিগত উপায়-উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ওসীলা শরী'আহ তথা কুরআন-হাদীস কর্তৃক বর্ণিত। ওসীলার ক্ষেত্রে যে সব উপায়-উপকরণ অবলম্বন করলে জীবন কর্মে সফল হওয়া যাবে, তা কুরআন-হাদীসে বিধৃত হয়েছে।[১২] সৃষ্টিগত উপায়-উপকরণকে বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্নে তিনি আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য হল হালাল উপায়, পক্ষান্তরে সুদ হল হারাম উপায়। শায়খ আল-আলবানী বলেন, মানুষ অনেক সময় কল্পনা করে যে, অমুক ওসীলায় জীবনে এ সফলতা এসেছে। তা আসলে সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি কুরআন-হাদীসের আলোকে অনেক উদাহরণ-উপমা উপস্থাপন করেন। যেমন এমন ধারণা পোষণ করা যে, রাতে নখ কাটলে ক্ষতি হয়। সত্যিই জীবনে যদি কোন ক্ষতি হয়, তবে এর কারণ হিসেবে রাতে নখ কাটাকে দায়ী করা সঠিক নয়।[১৩] শায়খ আল-আলবানী আরো বলেন, অনেকে পীর-বুযুর্গদের মাজারে গিয়ে অনেক বিষয়ের আকাংখা করেন, তাদেরকে ওসীলাহ মনে করেন। অনেকে আবার গণকদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেন। শায়খ আল-আলবানী বলেন, এগুলো শর'ঈ বিধানসম্মত নয়। এরপর তিনি শর'ঈ বিধানসম্মত ওসীলাহ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সবিস্তর আলোচনা করেন।[১৪]

তৃতীয় অনুচ্ছেদে শায়খ আল-আলবানী শর'ঈ বিধি-বিধানসম্মত ওসীলার স্বরূপ ও ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নাম উল্লেখপূর্বক ব্যক্তির নিজের দু'আ বা প্রার্থনা এবং ব্যক্তির সৎ আমল তার জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের কিংবা পরকালীন জীবনে নাজাতের ওসীলাহ হতে পারে। সেই সাথে কোন বুযুর্গ বা পরহেযগার ব্যক্তির কাছে দু'আ কামনা করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে পরহেযগার লোকের দু'আ ব্যক্তি বিশেষের জন্য উপকারে আসতে পারে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি কারো জন্যে ওসীলাহ হতে পারেন না বরং ওসীলাহ হল তার দু'আ।[১৫] তাওয়াস্‌সুল-এর এ ধারণাই শর'ঈ বিধি-বিধানসম্মত। হাদীস তাখরীজ করে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এমনটিই প্রমাণ করেছেন শায়খ আল-আলবানী রহ.।

---

১২. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আত-তাওয়াসসুল: আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু*, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ১৫-১৮

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি বাতিলপন্থী পীর-ফকিরদের নানাবিধ সন্দেহ-সংশয় তুলে ধরেন এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করেন। তিনি ইলম হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেন যে, তারা এসব বিষয়ে যে সব হাদীসের উপর নির্ভর করেছে, সেগুলো হয় দুর্বল কিংবা মওদূ' তথা বানোয়াট।[১৬]

শায়খ আল-আলবানীর তাওয়াস্সুল বিষয়ক এ গ্রন্থটি নি:সন্দেহে ব্যতিক্রম। ইতঃপূর্বে তাওয়াস্সুলের ধরন, প্রকৃতি, ভেদ-বিভাজন উল্লেখ করে তাওয়াস্সুল বিষয়ে অধিকতর হাদীসনির্ভর আলোচনার মাধ্যমে এত সুন্দর, স্পষ্ট, সাবলীল ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থ কেউ রচনা করেননি। এ ক্ষেত্রে শায়খ আল-আলবানী বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। এ গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। গ্রন্থটি শায়খ আল-আলবানীর শিষ্য মুহাম্মদ ঈদ আল-আব্বাসী তাহকীক করেছেন। ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বের হয়। পরবর্তীতে বৈরুতের আল-মাকতাবুল ইসলামী থেকে এটি একাধিকবার প্রকাশিত হয়।

তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদা

শায়খ আল-আলবানী রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদা' (تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجد) একটি মৌলিক গ্রন্থ। হাদীস তাখরীজের বাইরে এটিই তার প্রথম রচনা। উল্লেখ্য, শায়খ আল-আলবানীর পিতা শায়খ নূহ দামিশকের মসজিদে উমাবীর ইমাম ছিলেন। শায়খ আল-আলবানী জানতে পারেন যে, এ মসজিদটি কবরের উপর নির্মিত হয়। তারপর আল-আলবানী বিষয়টি তার উস্তাদ শায়খ বুরহানীকে অবহিত করেন এবং উক্ত মসজিদে সালাত বৈধ হবে না বলে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু শায়খ বুরহানী বিষয়টি এতটা গুরুত্ব দেননি। এরই প্রেক্ষিতে শায়খ আল-আলবানী উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি আল-মাকতাবুল ইসলামী থেকে ১৩৭৭ হিজরী সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। শায়খ আল-আলবানী উল্লেখ করেন, গ্রন্থটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয়ের আলোচনা অবতারণা করা হয়েছে। এক. কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের শর'ঈ হুকুম বা বিধান, দুই. কবরের উপর নির্মিত মসজিদে সালাত পড়ার হুকুম বা বিধান।[১৭]

এ গ্রন্থটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে কবরকে মসজিদে পরিণত করা বা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার মানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কবরকে মসজিদে পরিণত করা কবীরা

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-১৫৭

১৭. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদা*, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সং., ১৪০২ হি., পৃ. ৬

গুনাহ্। চতুর্থ অধ্যায়ে কতিপয় সন্দেহ-সংশয়ের জবাব প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কবরকে মসজিদে পরিণত করা হারাম ঘোষণার হিকমত ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কবরের উপর সালাত পড়া মাকরূহ। সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পূর্বোক্ত হুকুম বা বিধান মসজিদে নববী ব্যতীত সকল মসজিদকেই অন্তর্ভুক্ত করবে। এভাবে উপরোক্ত সাতটি অধ্যায়ের মাধ্যমে উক্ত গ্রন্থটিতে কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা এবং নির্মিত মসজিদের উপর সালাত পড়ার শর'ঈ হুকুম বা বিধান সবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদ'উহা

ফিকহুল হাদীস বিষয়ে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর রহ. এক অনবদ্য গ্রন্থ হল 'আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদ'উহা' (أحكام الجنائز وبدعها)। ১৩৭৩ হিজরী সনে ১১ ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার জনৈক সম্মানিত ব্যক্তির আত্মীয়ের জানাযার পর ঐ ব্যক্তি শায়খ আল-আলবানীকে জানাযা তথা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি সম্বন্ধে শর'ঈ বিধি-বিধান সংকলন করে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনার অনুরোধ জানান। শায়খ আল-আলবানী বলেন, আরব-অনারব বিশ্বের অনেক ব্যক্তি, যারা সুন্নতে নববীর একনিষ্ঠ অনুসারী, তারাও এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আমাকে এ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার আবেদন জানান।[১৮] শায়খ আল-আলবানী নিজেও মৃত ব্যক্তির জানাযা, কাফন-দাফন, তার জন্য দু'আ ও স্মৃতিচারণ ইত্যাদি বিষয়ে সমাজে প্রচলিত বহুবিধ রসম-রেওয়ায প্রত্যক্ষ করেন। যা রাসূলুল্লাহর স. সুন্নাহ পরিপন্থী এবং বিদ'আত। এসব বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক বিষয় অবহিত করা তিনি তাঁর কর্তব্য মনে করেন। আর এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই শায়খ আল-আলবানী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। শায়খ আল-আলবানী তাঁর এ গ্রন্থটিকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে আঠারটি শিরোনামে ১২৬টি আহকাম বা বিধি-বিধান বিধৃত করেন। দ্বিতীয় ভাগে তিনি জানাযা ও কাফন-দাফন ইত্যাদি বিষয়ে সমাজে প্রচলিত কতিপয় বিদ'আতের কথা আলোচনা করেন। ১৩৮২ হিজরী সনে ১৯ রবিউস সানী রবিবার দুপুর বেলায় দামিশকে বসে এ সংকলনটি সম্পন্ন করেন।[১৯] গ্রন্থটির প্রথম ভাগ বা আহকাম অংশের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

---

১৮. এ প্রসঙ্গে শায়খ আল-আলবানীর বক্তব্যটি নিম্নরূপ: وبذالك أكون قد حققت رغبة ذلك الأخ العزيز الذي كان السبب المباشر لتأليف الأحكام كما كنت ذكرت ذلك في المقدمة وهي رغبة يشاركه فيها الكثيرون من محيي السنة النبوية والحريصين على إحيائها في مختلف بلاد الدنيا عربا وعجما.। -মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তালখীসু আহকামিল জানাইয*, আম্মান: আল-মাকতাবুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০২ হি., পৃ. ৩

১৯. আল-আলবানী, তালখীসু আহকামিল জানাইয, পৃ. ৩০১

এ অংশে মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির প্রতি করণীয় এবং সেইসাথে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি বা কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করে সেটির তাখরীজ করা হয়েছে। হাদীসের আলোকে বিধি-বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্বেকার মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলোচনার পাশাপাশি এসব বিষয়ে বিভিন্ন ফিকহী গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হাদীসের আলোকে বিধানসমূহ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে একত্রিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে বিদ্যমান নানাবিধ ইখতিলাফ বা মতানৈক্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি সরাসরি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদানের চেষ্টা করেছেন। জানায়িয সম্পর্কে হাদীসের আলোকে বিধি-বিধানের এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চমৎকার গ্রন্থ।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশ বস্তুত এর মূল বিষয় বিধৃত করেছে। এ অংশে তিনি জানাযা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিদ'আতের কথা পুরাতন-নতুন যে সব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তা সংকলন করেছেন। তিনি যে সব গ্রন্থ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তন্মধ্যে ইবন হাযমের 'আল-মুহল্লা' (المحلى), ইবনুল হাজ্জ এর 'আল-মাদখাল' (المدخل), ইমাম শাতিবীর 'আল-ই'তিসাম' (الاعتصام), আবূ শামা এর 'আল-বা'ঈস 'আলা ইনকারিল বিদঈ' ওয়াল হাওয়াদিস' (الباعث على انكار البدع والحوادث) , শায়খ আলী মাহফূযের 'আল-ইবদা' ফী মাদাররিল ইবতিদা'' (الإبداع في مضار الإبتداع) , রশীদরেদার 'তাফসীরুল মানার', ইবনুল হুমাম এর 'ফাতহুল কাদীর' (فتح القدير) ও ইবনুল জাওযীর 'তালবীসু ইবলিস' (تلبيس إبليس) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া শায়খ আল-আলবানী নিজেও কতিপয় বিদ'আতের কথা উল্লেখ করেন। এসব বিদ'আত বর্ণনায় তিনি কোন গ্রন্থের হাওয়ালা দেননি। এতে প্রমাণিত হয়, এগুলো শায়খ আল-আলবানীর নিজস্ব মতামত এবং তাঁর দৃষ্টিতে এগুলো বিদ'আহ। এ গ্রন্থটি প্রকাশের পর বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে একে পাঠক সমাজে আরো সহজলভ্য করার জন্য ১৪০২ হিজরী সনে তিনি এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করেন। এবং সে বছরেই গ্রন্থটি জর্ডানের আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত হয়।

আদাবুয যিফাফ ফীস সুন্নাহ আল-মুত্বাহ্হারা

হাদীসের আলোকে সমাজ-সংস্কার ও শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে শায়খ আল-আলবানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো 'আদাবুয যিফাফ ফিস সুন্নাহ আল-মুত্বাহ্হারাহ' (آداب الزفاف في السنة المطهرة) । যিফাফ অর্থ বাসর তথা বিবাহের 'আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনক্ষণ। এজন্য বাসর রাতকে আরবীতে 'লাইলাতুয যিফাফ' (ليلة الزفاف) বলা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহোত্তর স্বামী-স্ত্রীর বাসর তথা বিবাহকেন্দ্রিক নানাবিধ বিষয়ে আধুনিক যুগে মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট হয়েছে বহু রকম অপসংস্কৃতি।

এসব কুসংস্কার থেকে মুসলিম উম্মাহকে বের করে এনে বিবাহ অনুষ্ঠানের মত পবিত্র বিষয়ে মুসলিম উম্মাহকে সুন্নতে নববীর উপর প্রতিষ্ঠিত করাই হল ঈমানের দাবী। আর এ দাবী পূরণের লক্ষ্যেই শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. 'আদাবুয যিফাফ' গ্রন্থটি রচনা করেন।

শায়খ আল-আলবানী দামিশকে অবস্থানকালীন সময়ে অনেকের বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসব বিবাহ অনুষ্ঠান এবং বিবাহোত্তর বাসর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমাজে যে সব কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, তা নিয়ে তিনি বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতেন। শায়খ আল-আলবানীর একজন বন্ধু হলেন শায়খ আব্দুর রহমান আলবানী। তিনি শায়খ আল-আলবানীকে স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. এর আদর্শের আলোকে একটি পুস্তিকা রচনার আবেদন জানান। শায়খ আল-আলবানী তার বন্ধুর আবেদনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটিতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। যেমন বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে স্বামীর সদয় ব্যবহার, স্ত্রীর মাথায় হাত রাখা ও তার জন্য দু'আ করা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সাথে সালাত আদায় করা, সহবাসের নিয়মাবলি, সহবাসের পর ঘুমানোর পূর্বে অজু করা, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে গোসল করা, আযলের বৈধতা, স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস না করা ও ওলীমা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থটিতে সহীহ হাদীসের আলোকে চমৎকার আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে শায়খ আল-আলবানী নারীদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার অবৈধ বলেছেন। শায়খ আল-আলবানীর এরূপ মন্তব্যে তিনি কঠোর সমালোচনার শিকার হন।

সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি স.

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে গোটা বিশ্বের মুসলিম সমাজে যে সব গ্রন্থ আলোড়ন সৃষ্টি করে, তন্মধ্যে 'সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি স.' (صفة صلاة النبي صلى الله علية وسلم) গ্রন্থটি অন্যতম। যার রচয়িতা হলেন শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হাদীসে নববীর আলোকে সালাতের স্বরূপ নির্ধারণে এটি একটি স্বার্থক প্রয়াস। মহানবী স. যেভাবে সালাত আদায় করতেন, ধারাবাহিকভাবে তারই একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটির নাম রাখেন, صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها -'তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত নবী পাক স.-এর সালাতের স্বরূপ, যেন আপনি তা প্রত্যক্ষ করছেন'। সালাতের উপর এ ধরনের গ্রন্থ ইতঃপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি।

বিংশ শতাব্দির ষাটের দশকে শায়খ আল-আলবানী দামিশকে সালাফীদের মজলিসে নিয়মিত দরস প্রদান করতেন। এভাবে প্রায় চার বছর অতিবাহিত হয়। এরই মাঝে

কোন একদিন তিনি হাফিয মুনযিরীর 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' নামক গ্রন্থের কিতাবুস সালাত (كتاب الصلوٰة) অংশের পাঠ দান করেন। তাতে ইসলামী যিন্দিগীতে সালাত যে কত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ইবাদত, তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেন। তিনি তাঁর দরসে অংশগ্রহণকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান এবং এ ইবাদতের মাধ্যমে কাঙ্খিত সওয়াব অর্জন করা সম্ভব নয়, যদি না সে সালাত সেভাবে আদায় করা হয়, যেভাবে রসূলুল্লাহ স. আদায় করেছেন। মহানবী স. বলেন, صلوا كما رأيتموني أصلي -অর্থাৎ তোমরা তেমনিভাবে সালাত পড়, যেমনিভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখেছ।[২০] শায়খ আল-আলবানী বলেন, আমার ধারণা হল, সালাতের ক্ষেত্রে যে যতটুকু রসূলুল্লাহ স.-এর সালাতের পদ্ধতি অনুসরণ করবে, সে ততটুকুই সওয়াব অর্জন করবে। এ রকম এক বাস্তবতা অনুধাবনের পরেই শায়খ আল-আলবানী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। শায়খ আল-আলবানী আরো বলেন, সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ ও নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য বিদ্যমান। তাছাড়া মহানবীর সালাত সম্পর্কে আলিমদের হাদীসনির্ভর বক্তব্যগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান। যা পাঠ করে এ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা সাধারণ পাঠকবৃন্দের জন্য কঠিনই বটে।[২১] সুতরাং শায়খ আল-আলবানীর দৃষ্টিতে সালাতের ব্যাপারে এ রকম একটি গ্রন্থ রচনা করা দরকার, যা পাঠ করে পাঠকবৃন্দ সহজেই সালাতের আদ্যোপান্ত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। অধিকন্তু শায়খ আল-আলবানী মনে করেন, হাদীসসমূহই সালাত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের মূল উৎস হওয়া উচিত।[২২] সুতরাং মুসলমানরা যেন সহীহ হাদীসের আলোকে সালাত সম্পর্কে সহজেই জ্ঞান আহরণ করতে পারেন, এ চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করেই শায়খ আল-আলবানী 'সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি' গ্রন্থটি রচনা করেন।

শায়খ আল-আলবানীর এ গ্রন্থটি প্রধানত হাদীসনির্ভর। মাঝে মাঝে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি রয়েছে। শায়খ আল-আলবানী দাবি করেন, গ্রন্থটিতে এমন সব হাদীসের ব্যবহার করা হয়েছে, যা সহীহ ও সুপ্রমাণিত। গ্রন্থটির শুরু একটি ভূমিকার মাধ্যমে। গ্রন্থটির উপরের অংশে মূল ভাষ্য, নীচে টীকা-টিপ্পনী। যা সংযোজন করেন শায়খ আল-আলবানী নিজেই। টীকায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাসহ গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত হাদীসসমূহের তাখরীজ করেন। মূল আলোচনায় শায়খ

---

২০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আযান, পরিচ্ছেদ: আল-আযান লিল-মুসাফিরি..., বৈরূত: দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., খ. , পৃ. , হাদীস নং-৬০৫

২১. শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি স.*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪১১ হি., পৃ. ৩৬-৩৭

২২. প্রাগুক্ত

আল-আলবানী নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করেননি। শুধুমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে করেছেন। শায়খ আল-আলবানী মনে করেন, পূর্বেকার ও বর্তমান সকল মুহাদ্দিসের এটিই মাযহাব যে, তারা কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটির ভূমিকাতে চার মাযহাবের ইমামদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি বিধৃত করেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা বলেন, إذا صح الحديث فهو مذهبي -অর্থাৎ যখন কোন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হবে, সেটিই আমার মত ও পথ।[২৩] শায়খ আল-আলবানী ১৩৮১ হিজরী সনে এ গ্রন্থটির কাজ সমাপ্ত করেন। এ বছরেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাঁর এ গ্রন্থটি গোটা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এটি সালাত আদায়ে মুসলিম সমাজকে সুন্নতে নববীর অনুসরণের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

জিলবাবুল মার'আহ্ আল-মুসলিমাহ্ ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ

শায়খ আল-আলবানীর সম-সাময়িক মুসলিম বিশ্বে, বিশেষত সিরিয়া, ইরাক ও মিসরে নারী সমাজের পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে দুটো চরম পন্থা বিরাজমান ছিল। একদিকে হাত, মুখসহ সারা শরীর ঢেকে কঠোর পর্দা অনুশীলনের প্রবণতা যে রকম লক্ষণীয়, আবার অন্যদিকে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে উন্নাসিকতা এবং বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার উন্মাদনায় গা ভাসিয়ে দেয়ার দৃশ্যটিও পরিদৃষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের সঠিক ফায়সালা কি, তা জানার জন্য লোকেরা আলিমদের দ্বারস্থ হতো।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শেষের দিকে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর জনৈক বন্ধুর বিবাহ অনুষ্ঠান আসন্ন হলে ঐ বন্ধুটি কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে পর্দা প্রথা তথা মুসলিম নারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা রচনার অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর বন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ' (حجاب المرءة المسلمة) নামক পুস্তিকাটি রচনা করেন।[২৪] ১৩৭০ হিজরী সনে গ্রন্থটি 'আল-মাকতাবুল ইসলামী' নামক সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়।

পুস্তিকাটিতে শায়খ আল-আলবানী প্রধানত নারীদের আপাদমস্তক আবৃতকারী পোষাক তথা চাদর বা বোরকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল-কুরআনের ভাষায় যাকে জিলবাব বলা হয়েছে।[২৫] আর এ জিলবাবের স্বরূপ নির্ধারণে শায়খ আল-আলবানী আটটি শর্ত আরোপ করেন।

---

২৩. *হাশিয়া ইবন আবেদীন*, খ. ১, পৃ. ৬৩

২৪. শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, আলগুরিয়াহ, মিসর: দারুস সালাম লিত ত্বব'আতি ওয়ান নাশরি, ১৪২৩ হি., পৃ. ৩৫-৩৬

২৫. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

এক. استيعاب جميع البدن إلا ما استثنى -পোষাকটি এরকম হবে যার মাধ্যমে সততই যা প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে;

দুই. أن لايكون زينة في نفسه -পোষাকটি চাকচিক্যময় হবে না;

তিন. أن يكون لايشف صفيقا -পোষাকটি পাতলা হবে না;

চার. ان يكون فضفاضا غير ضيق -পোষাকটি ঢিলেঢালা হওয়া, আঁটসাট বা সংকীর্ণ না হওয়া;

পাঁচ. ان لايكون مبخرا مطيبا -পোষাকটি সুগন্ধি যুক্ত না হওয়া;

ছয়. أن لايشبه لباس الرجل -পোষাকটি পুরুষদের পোষাক সদৃশ না হওয়া;

সাত. ان لايشبه لباس الكافرات -পোষাকটি কাফির মহিলাদের পোষাক সদৃশ না হওয়া;

আট. ان لايكون لباس شهرة -পোষাকটি খ্যাতিজনক না হওয়া।[২৬]

শায়খ আল-আলবানী জিলবাবের স্বরূপ আবিষ্কারে যে শর্তসমূহ আরোপ করেছেন, তিনি এর সমর্থনে প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোর তাখরীজও করেছেন। শায়খ আল-আলবানী বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এ পোষাক দ্বারা নারীদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কজিসহ আবৃত করা ওয়াজিব নয়। বরং তাঁর মতে, নারীরা ঘরের বাহিরে গেলেও তাদের জন্য মুখমণ্ডল ও কজি পর্যন্ত দুই হাত খোলা রাখা জায়িয। তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি হাদীসের পাশাপাশি আল-কুরআনের সূরা আন-নূর এর ৩১ নম্বর আয়াতটিও দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন।[২৭]

ইরশাদ হয়েছে:

> وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
>
> অর্থাৎ এবং আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সতত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।[২৮]

সাহাবীরা এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রা.-এর মতামতসহ মহানবী স. এর সামনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেছেন। যেমন বিদায় হজ্জের দিবসে ফদল ইবন আব্বাস রা. এক যুবতীর দিকে দৃষ্টি দিলে মহানবী স. ফদল ইবন আব্বাসের

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

২৬. *জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ*, পৃ. ২১৩-২১৬

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

২৮. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১

চেহারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। কিন্তু ঐ মহিলাকে তার মুখমণ্ডল আবৃত করার নির্দেশ দেননি।[২৯] এতে প্রমাণিত হয়, মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অপরিহার্য নয়।

মূলত মহিলাদের মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত পর্দার অন্তর্ভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মহিলাদের মুখমণ্ডল সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা খোলা রাখা জায়িয নয় বরং খোলা রাখা হারাম। আরেকদল আলিম বলেন, মুখমণ্ডল ঢেকে রাখাই বিদ'আত এবং এটি দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি।[৩০] শায়খ আল-আলবানী এ দু' শ্রেণীর আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন। শায়খ আল-আলবানীর মতে, মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয় বরং খোলা রাখা জায়িয। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ঢেকে রাখা জায়িয নেই। বরং তাঁর বক্তব্য হল, মহিলাদের মুখ ঢেকে রাখাই উত্তম। তিনি বলেন:

أني بجانب تقريري أن الوجه ليس بعورة.....قد قررت أن الستر هو الأفضل.

অর্থাৎ মুখমণ্ডল সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমি আমার এ বক্তব্যের পাশাপাশি এ সিদ্ধান্তও দিয়েছি যে, মুখমণ্ডল ঢেকে রাখাই উত্তম।[৩১]

এ গ্রন্থের মাধ্যমে শায়খ আল-আলবানী মহিলাদের মুখ ও হাত খোলা রাখা বৈধ ফতওয়া দেয়ার পর বিষয়টি আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলিমদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেউ কেউ গ্রন্থটির সমালোচনা করেন এবং শায়খ আল-আলবানী এসব সমালোচনার জবাবও প্রদান করেন। তাছাড়া শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটির পূর্ববর্তী নামও পরিবর্তন করেন। গ্রন্থটির পূর্বের নাম ছিল, 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ' (حجاب المرءة المسلمة)। পরবর্তীতে তিনি এ গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'জিলবাবুল মারআহ আল-মুসলিমাহ ফীল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' (جلباب المرءة المسلمة في الكتاب و السنة)।[৩২]

পরিশেষে বলা যায় যে, শায়খ আল-আলবানী মুসলিম উম্মাহর জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করার পথকে সহজ ও সুগম করার লক্ষ্যে সহীহ হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান সম্বলিত এসব গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি বিশ্বময় জনপ্রিয়তা লাভ করে।

---

২৯. *জিলবাবু মারআতিল মুসলিমাহ*, পৃ. ৬১-৬২

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৩২. শায়খ আল-আলবানীর মতে, হিজাব শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। এটি সব ধরনের পর্দা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষত ঘর বা বাড়ীতে বা অন্য কোন জায়গায় যে পর্দা বা আড়াল তৈরি করা হয়, তাকে হিজাব বলে। অন্যদিকে জিলবাব পর্দার অংশ হলেও এটি বিশেষভাবে মুসলিম নারীর পোষাকের সাথে সম্পৃক্ত। যে কারণে শায়খ আল-আলবানী ১৪১২ হিজরী সনে প্রকাশিত এ গ্রন্থটির নতুন সংস্করণে এর নামকরণে 'হিজাব' শব্দটির পরিবর্তে 'জিলবাব' শব্দটি ব্যবহার করেন।

খ. সহীহ হাদীস সংকলনে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়

শায়খ আল-আলবানী রহ. সহীহ এবং দঈফ ও মওদূ' হাদীসের পৃথক দুটো সংকলন রচনা করেন। তিনি সহীহ হাদীসের সংকলনে কখনো কখনো হাদীসের বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম ব্যবহার করেছেন, কখনো হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার কখনো কোন মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করেছেন। শায়খ আল-আলবানী সহীহ হাদীস সংকলনে আকীদা, ইবাদত, আখলাক ও ইতিহাসসহ নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং এসব বিষয়ে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান বিধৃত করেছেন ও তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আকীদা বিষয়ক শর'ঈ বিধি-বিধান

সহীহ হাদীস সংকলনে আকীদা বিষয়ক নানাবিধ প্রসঙ্গে বিস্তর আলোচনা করে এ বিষয়ে শর'ঈ বিধি-বিধান বিধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় ও বিধৃত শর'ঈ বিধি-বিধানের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল। এক. বান্দার কাজের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ, শায়খ আল-আলবানী তাঁর আলোচনায় এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। দুই. আসমান-জমিন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজিব। তিন. আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা। চার. আল্লাহর সিফাত মেনে নিলে তাশবীহ হয় না। পাঁচ. মুসলমানদের যে সব সন্তান ছোট অবস্থায় বা শিশুকালে মারা যায়, তারা জান্নাতে যাবে। ছয়. ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সাত. কাবার নামে হলফ করা জায়িয নয়। আট. জাযীরাতুল আরবে তওহীদ জীবিত থাকবে। নয়. দুনিয়ার কোন কিছু আল্লাহর নামে চাওয়া বৈধ নয় এবং আল্লাহর নামে কিছু প্রার্থনা করলে, তা প্রদান না করা বৈধ নয়। দশ. ঝাড়ফুঁক সংক্রান্ত আলোচনা এবং তাবিয-কবয পরিধান করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এগার. কারবালাকে পবিত্র মনে করা বৈধ নয়। বার. রাফেযীদের মতামত খণ্ডন। তের. আল্লাহর ওলীদের আলামতসমূহ। চৌদ্দ. নূরে মুহাম্মদী অনাদি নয় এবং যারা নূরে মুহাম্মদীকে অনাদি বলে বা প্রথম সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে, তাদের মতামত খণ্ডন। পনের. কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতামত খণ্ডন। ষোল. বাতাসকে অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ।

ইবাদত বিষয়ক শর'ঈ বিধি-বিধান

সহীহ হাদীসের সংকলনে শায়খ আল-আলবানী ইবাদত সম্পর্কে নানাবিধ শর'ঈ বিধি-বিধান বিধৃত করেছেন। তন্মধ্যে কিছু বিষয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল। এক. অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ। দুই. গোসল ও ওযুতে পানি ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে। তিন. ওযু করার সময় দুই কান মাসেহ করা ফরয, তবে মাথা মাসেহ করার পানি দিয়ে কান মাসেহ করলেই যথেষ্ট হবে। চার. ওযু করতে গিয়ে বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে তারতীব অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। পাঁচ. মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার বিধান। ছয়. রফউল ইয়াদ তথা সালাতে হাত উঠানো সংক্রান্ত আলোচনা। সাত. সালাত রত অবস্থায় অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত

করা বৈধ। আট. সালাত রত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম। নয়. ছাগল পালনের জায়গায় সালাত আদায় করা জায়িয। দশ. সালাত ছেড়ে দেয়ার ভয়ানক পরিণতি। এগার. সালাত পরিত্যাগকারীর ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান। বার. প্রয়োজনে মুকীম অবস্থায় তথা মুসাফির না হয়েও দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার বিধান। তের. সালাতের জন্য সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান সম্পর্কিত বিধান। চৌদ্দ. সালাতের কাতার সোজা করার সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত করা সম্পর্কিত আলোচনা। পনের. সালাতুল বিতর সুন্নত হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা। ষোল. ইমাম সাহেব আমীন উচ্চ স্বরে বলার বিধান সম্পর্কে আলোচনা। সতের. একজন ইমামের ডানে সোজাসুজি দাঁড়ানো সুন্নত। আঠার. ফজরের সালাত জামাতে পড়ার ফযীলত সংক্রান্ত আলোচনা। উনিশ. ঈদের সালাত আদায়ের লক্ষ্যে সকাল সকাল বের হওয়া। বিশ. ঈদের খুতবা দেয়ার সময় হাতে লাঠির উপর নির্ভর করা। একুশ. জুমু'আর সালাতের আদবসমূহ। বাইশ. অর্থের বিনিময়ে কুরআন তিলাওয়াত হারাম। তেইশ. মুশরিককে দাফন করার বিধান। চব্বিশ. কাফিরের উপর যাকাত ফরয নয়। পঁচিশ. পাঁচ বছর অন্তর হজ্জ আদায় করা। ছাব্বিশ. হজ্জে মহিলাদের চুল খাট করার বিধান। সাতাশ. মুসলিম পিতার পক্ষ থেকে সওম ও সদকা আদায় করার বিধান। আটাশ. সফর অবস্থায় সওম পালনকারীর উপর সওম ভঙ্গকারীর মর্যাদা। উনত্রিশ. রমযান মাসে সওম পালন অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করা বৈধ। ত্রিশ. ফজরের আযান না হওয়া সত্ত্বেও খাবার থেকে বিরত থাকা বিদ'আত। একত্রিশ. তারাবীহ এর সালাতের রাক'আতের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা। বত্রিশ. জিহাদ সম্পর্কিত বিধান।

আদব-আখলাক ও মু'আমালাত সম্পর্কিত শর'ঈ বিধি-বিধান

সহীহ হাদীসের সংকলনে আদব-আখলাক সম্পর্কিত শর'ঈ বিধি-বিধানও আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু বিষয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল। এক. সৌজন্য ও শিষ্টাচারসমূহ। দুই. সন্তান লালন-পালনের নিয়ম ও বিধান। তিন. খাদেমকে ক্ষমা করার বিধান। চার. পায়খানায় যাওয়ার আদবসমূহ। পাঁচ. সফরের আদবসমূহ। ছয়. বসার আদব। সাত. রাস্তার পার্শ্বে বসার আদবসমূহ। আট. খাওয়া-দাওয়ার আদবসমূহ। নয়. প্রচণ্ড গরম খাবার না খাওয়া। দশ. পরিত্যক্ত খাবার খাওয়ার বিধান। এগার. সাদা চুলওয়ালা অর্থাৎ প্রবীণদেরকে সম্মান করা। বার. হাতে চুম্বন করা সুন্নত কিনা। তের. বৈঠক ও পরস্পর আলোচনার আদব। চৌদ্দ. সহজ পন্থা অবলম্বন ওয়াজিব। পনের. মুহাররামাত বা নিজ স্ত্রী, সন্তান ছাড়া অন্য মহিলাকে বিনা প্রয়োজনে স্পর্শ করা হারাম। ষোল. মহিলাদের মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। সতের. অন্য কোন বিয়ে করবে না, কোন মেয়েলোক এ শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে এ শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। আঠার. ভালবাসার চিকিৎসা বিবাহ। উনিশ. কুমারী নারী বিয়ে করার নির্দেশ ও এর রহস্য। বিশ. জন্ম নিয়ন্ত্রণ মাকরূহ। একুশ. মুত'আ বিবাহ হারাম। বাইশ. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। তেইশ. কোন মহিলা তার সন্তানের অধিক

হকদার, সে মহিলা অন্য কোন বিবাহ করার পূর্ব পর্যন্ত। চব্বিশ. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীদের সাথে কথোপকথন নিষিদ্ধ। পঁচিশ. হারাম দ্বারা চিকিৎসা হারাম। ছাব্বিশ. যালিমকে তার যুলুম থেকে বিরত রাখা ওয়াজিব। সাতাশ. সাদা চুলের রং পরিবর্তন করা জায়িয, তবে সাদা চুল কালো করা যাবে না। আটাশ. স্বর্ণ রৌপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম। উনত্রিশ. মসজিদ চাকচিক্যময় করা মাকরূহ। ত্রিশ. কোন মুসলমানের একাকী সফর করার বিধান। একত্রিশ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত বিপন্ন মানুষকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা ওয়াজিব। বত্রিশ. জমি ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতি নেই বা এটি মন্দ নয়। তেত্রিশ. কোন কিছু পান করার নিয়ম ও দাঁড়িয়ে পান করার বিধান।

গ. হাদীস তাখরীজের পাশাপাশি হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা

শায়খ আল-আলবানী প্রায় ৮০টি গ্রন্থের হাদীস তাখরীজ করেছেন। এসব হাদীস তাখরীজ করতে যেয়ে তিনি হাদীসের বিষয়বস্তু অনুসারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে হাদীসের উপর দরস প্রদান করেছেন। এমনিভাবে তিনি হাদীসের আলোকে অসংখ্য ফতওয়া বা শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা করেছেন। তাঁর এসব ফতওয়া বা শর'ঈ বিধি-বিধান ও দরসের সংকলনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাঁর বিধৃত ফতওয়া বা শর'ঈ বিধি-বিধান ও দরসের এ সংকলনটি সমাপ্ত করা হয় বিশাল বিশাল আট খণ্ডে। যার নামকরণ করা হয়, 'মাজমূ' ফাতাওয়াউশ শায়খ আল-আলবানী ওয়া মুহাদারাতুহু' (مجموع فتاوي الشيخ الألباني ومحاضراته) হিসেবে। শায়খ আল-আলবানীর শিষ্যরা অনুমান করেন, তাঁর বিধৃত সব ফতওয়া বা শর'ঈ বিধি-বিধান যদি সংকলন করা হয়, তাহলে এ সংকলনটি বৃহৎ আকারের ৩০ খণ্ডে রূপ ধারণ করবে।[৩৩]

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সমাজ সংস্কার ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. তাঁর সহীহ ও দঈফ হাদীস সংকলন এবং তাখরীজ-তাহকীককৃত গ্রন্থে জীবনের নানা দিক নিয়ে অগণিত বিষয়ে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয় করেছেন। তাছাড়া তাঁর লিখিত মৌলিক গ্রন্থে উপস্থাপিত সকল বিধি-বিধানই হাদীসভিত্তিক। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর বিধৃত এসব শর'ঈ বিধি-বিধানের যদি কোন সংকলন রচনা করা হয়, তাহলে সেটি তার সহীহ ও দঈফ হাদীসের সংকলনকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আমাদের ধারণা। অতএব, হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে শায়খ আল-আলবানীর অবদান যে কতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত তা সহজেই অনুমেয়।

---

৩৩. আল-মিসরী, সাফাহাতুন বায়দা, পৃ. ৮৮

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫
জানুয়ারি : মার্চ ২০১৫

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইনফাক

আবদুছ ছবুর মাতুব্বর*

Infāq in the Light of the Quran and Hadith

ABSTRACT

Among all the ways and means of worship, Infāq or spending wealth for the sake of Allah is considered to be one the significant ways of worship. The concept of Infāq has importance and significance in Islam. It is also called monetary worship. Generally people irrespective of being rich, poor, Muslims, Non-Muslims, legal money earners or illegal money earners all spend wealth. In this paper, the term Infaq refers to spending legal earned wealth by Muslims for a legal cause (i.e. the cause approved by sharī'ah). Spending wealth must be done according to the commandment of Allah, which means it is sometimes obligatory (fard), compulsory (wājib), preferred (mustahab), supererogatory (nafal), and prohibited (harām). Islam clearly states the principles of how wealth should be earned and spent including the purpose, amount, and method of spending wealth. Man has numerous ways and means of earning wealth, which may be legal or illegal, but the commandment of Islam is not to earn wealth through illegal means. In addition, permissible ways of earning wealth are also well defined. In order to achieve success in the hereafter, Islam encourages humankind to spend voluntarily. Islam refers to one as stingy who does not spend; again it does not allow extravagance and unnecessary expenditure; it also postulates that spending wealth for a good cause guarantees increase of wealth. This paper prepared by applying analytical method and described various aspects of infāq including definition and rules in the light of Quran and Sunnah.

Keywords: Infāq; fields of expenditure; monetary worship; principles of expenditure.

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সারসংক্ষেপ

মুসলিম জীবনে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত পালনের যতগুলো মাধ্যম আছে তন্মধ্যে ইনফাক বা সম্পদ ব্যয় অন্যতম। ইসলামে ইনফাকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। একে ইবাদতে মালী বা আর্থিক ইবাদতও বলা হয়। মানুষ মাত্রই সম্পদ ব্যয় করে থাকে। ধনী, গরীব, মুসলিম, অমুসলিম, ন্যায় পথে উপার্জনকারী, অন্যায় পথে উপার্জনকারী সবাই ব্যয় করে। ইনফাক দ্বারা মুসলিমদের বৈধ আয় থেকে বৈধ (ইসলামের বিধান অনুযায়ী) পথে ব্যয়কেই বুঝানো হয়েছে। সম্পদ ব্যয় ইসলামের নির্দেশ। ক্ষেত্রভেদে সম্পদ ব্যয় করা ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, নফল এবং হারাম। সম্পদ ব্যয়ের খাত কী কী, ব্যয়ের পরিমাণ কতটুকু এবং ব্যয়ের পদ্ধতি কী হবে? ইসলাম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রদান করেছে। একজন মানুষের সামনে সম্পদ আয়ের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ হাজারো পথ রয়েছে; কিন্তু ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে অবৈধ পথে সম্পদ আয় করা যাবে না। বৈধ পথে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করার পদ্ধতিও নির্ধারিত। পরকালের সফলতা অর্জনে ইসলাম মানুষকে স্বেচ্ছায় ব্যয় করতে উৎসাহ দিয়েছে এবং ব্যয় না করলে তাকে কৃপণ বলে আখ্যায়িত করেছে। অপচয়-অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে। সাথে সাথে বৈধ পথে ব্যয় করলে সম্পদ বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত অত্র প্রবন্ধে ইনফাকের পরিচিতি এবং কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইনফাকের সামগ্রিক নীতিমালা তুলে ধরার প্রায়াস নেয়া হয়েছে।

মূলশব্দ: ইনফাক, ব্যয়ের খাত, মালী ইবাদাত, ব্যয়ের নীতিমালা

ভূমিকা

ইনফাক বা সম্পদ ব্যয় করা হয়ে থাকে মালিকানাধীন সম্পদ থেকে। মালিকানাধীন সম্পদ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন:

﴿ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾

আসমানে এবং জমিনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ্র মালিকানাধীন।[২]

উপর্যুক্ত আয়াত দুটিসহ অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, সকল সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা যেমন আসমান ও জমিনের সকল সম্পদ মানুষের ব্যবহার উপযোগী করেছেন, তেমনি সম্পদের সঠিক ব্যবহারে মানুষকে

---

১. আল-কুরআন, ০৫ : ১২০

২. আল-কুরআন, ০২ : ২৮

দিয়েছেন নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ-তে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

وَقَدْ جَعَلَ الْإِسْلاَمُ مِلْكَ الْأَمْوَالِ اسْتِخْلاَفًا وَمِنْحَةً رَبَّانِيَّةً لأَنَّ الْمَالِكَ الْحَقِيقِيَّ لِلْأَمْوَالِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَكِنَّهُ أَعْطَى لِلْإِنْسَانِ حَقَّ التَّمَلُّكِ وَاسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْأَمْوَالِ

ইসলাম সম্পদের মালিকানা লাভ করাকে (আল্লাহ্‌র) প্রতিনিধিত্ব এবং প্রতিপালকের দানরূপে সাব্যস্ত করেছে। কারণ, সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন মহান আল্লাহ্। তবে তিনি মানুষকে মালিকানার অধিকার লাভ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং সম্পদে তাকে প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছেন।[৩]

মহান আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾

তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে খরচ করো।[৪]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾

তিনি তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তোমরা তা থেকে প্রদান করো।[৫]

তিনি অনত্র ইরশাদ করেন:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন।[৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾

অতঃপর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি।[৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো; অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।[৮]

---

৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ্, খ. ৩৯, পৃ. ৩৩
৪. আল-কুরআন, ৫৭ : ০৭
৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩
৬. আল-কুরআন, ০৬ : ১৬৫
৭. আল-কুরআন, ১০ : ১৪
৮. আল-কুরআন, ৫৭ : ০৭

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আয-যামাখশারী বলেন:

> أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها وإنما موّلكم إياها وخوّلكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنوّاب
>
> তোমাদের করায়ত্ত সম্পদসমূহ সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্র সম্পদ। তিনি তোমাদেরকে কেবল তা ব্যবহার ও ভোগ করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তিনি তোমাদেরকে তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। কেননা এই সকল সম্পদ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সম্পদ নয়। এ ক্ষেত্রে তোমরা কেবল উকিল ও প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।[৯]

উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষ বিভিন্নভাবে আল্লাহ তা'আলার এই দুনিয়ার সম্পত্তির নিয়ন্ত্রক ও প্রতিনিধি। তাই মহান আল্লাহ সম্পদের মধ্যে ফকীর, মিসকিন, আত্মীয়স্বজন প্রমুখের জন্য অনেক অধিকার আরোপ করেছেন।[১০]

মানুষের সম্পদের মালিক হওয়ার মাধ্যম হলো তিনটি:

১. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ।

২. উপহার, উপঢৌকন বা পুরস্কার সূত্রে পাওয়া সম্পদ।

৩. নিজের উপার্জিত সম্পদ।

এই তিনভাবেই মানুষ সম্পদের মালিক হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ﴿وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ "এবং এই জন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।"[১১] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইনফাক বা ব্যয় করা হবে নিজস্ব মাল (সম্পদ) থেকে। সম্পদের মালিকানা নির্ধারণে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বক্তব্য হচ্ছে, 'সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক হচ্ছে সমাজ, সংগঠন বা রাষ্ট্র।' সুতরাং সম্পদ ব্যয়ে মানুষের কোন ধরনের স্বাধীনতা নেই। অপরদিকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় 'মানুষ তার সম্পদের উপর একচ্ছত্র অধিকারী বা মালিক। সে তার সম্পদ ব্যয়ে পূর্ণ স্বাধীন। ব্যয় করা না করা তার ইচ্ছা। ব্যয়ের পথ বৈধ কি অবৈধ এটা তার সিদ্ধান্ত। ব্যয়ের পরিমাণ সে-ই নির্ধারণ করবে।' ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মত নয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আয়ের ক্ষেত্রে যেমন বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক কিছু বিধি-বিধান আছে, ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি কিছু

---

৯. আবুল কাসিম জারুল্লাহ্ আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, খ. ৬, পৃ. ৪৯১

১০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৯, পৃ. ৩৩

নিয়ম-কানুন রয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিমকে অনুসরণ করতে হয়। ইসলাম ইনফাক বা সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে, কখনো ব্যয় করাকে ফরয করে দিয়েছে, আবার কখনো নফল নির্ধারণ করেছে।

ইনফাকের সংজ্ঞা

ইনফাক (إنفاق) শব্দটি আরবী। এর অর্থ ব্যয় করা, খরচ করা।[১২] ইনফাক শব্দটি নাফাকা (نفق) শব্দমূল থেকে উদগত। বিখ্যাত আরবী অভিধানবেত্তা ইবনু ফারিস বলেছেন, এই শব্দমূলটির মূলত দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হচ্ছে, কোনো জিনিস শেষ হয়ে যাওয়া কিংবা চলে যাওয়া; অপরটি হচ্ছে, কোনো জিনিস গোপন করা কিংবা ঢেকে ফেলা।[১৩] ইনফাকের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মনজের কাহ্‌ফ বলেন:

> Conceptually Infaq in Shari'ah means spending away for the betterment of the society and its members including the giver and her/his family.

শরী'আহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে ইনফাক অর্থ হলো, দানকারী এবং দানকারীর পরিবারসহ সমাজ ও সমাজের সদস্যগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা।[১৪]

শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ আল-'আল্লাফ আল-গামিদী ইনফাক-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

> الإنفاق إخراج المال الطيب في الطاعات والمباحات
>
> ইনফাক হলো, আল্লাহ্‌র অনুসরণমূলক ও বৈধ ক্ষেত্রসমূহে পবিত্র সম্পদ থেকে খরচ করা।[১৫]

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ইনফাক রয়েছে। অবস্থাভেদে কোনটা বাধ্যতামূলক (ফরয) যেমন যাকাত, উশর, খারাজ, সামর্থ্যানুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। কোনটা বাধ্যতামূলক না হলেও নৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন ওয়াক্‌ফ, ওয়াসিয়্যাত, সাদাকা ইত্যাদি।

---

১১. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৪

১২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ১৪৬

১৩. ইবনু ফারিস, *মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ্*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ৪৫৪

(نفق) النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدلُّ أحدُهما على انقطاعِ شيءٍ وذَهابه، والآخر على إخفاءِ شيءٍ وإغماضِه.

১৪. http://monzer.kahf.com/papers/english/Infaq_in_the_Islamic_Economic_System.pdf, Access date : 12.01.2016

১৫. আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ আল-আল্লাফ আল-গামিদী, *ফাযলুস সাদাকাহ্ ওয়াল ইনফাক*, মক্কা মুকাররমাহ্: ১৪২৭ হি.

ইনফাকের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা

১. নিজের জন্য ব্যয়

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক কোন ব্যক্তি তার কর্তৃত্বে আসা সম্পদ থেকে নিজের জন্য ব্যয় করার অধিকার রয়েছে। নিজের জন্য ব্যয় না করে নিজেকে ধ্বংস করে দেয়ার কথা ইসলাম বলে না। বরং নিজেকে রক্ষার জন্য বলা হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।[১৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র।[১৭]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! খরচ করো, আমি তোমার জন্য খরচ করবো।[১৮]

২. পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয়

পরিবারের সদস্য যেমন নিজ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা ও একান্নভুক্ত অসমর্থ ভাইবোন প্রমুখের জন্য ব্যয় করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। যেমন: আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾

পুরুষেরা নারীদের (কাজ-কর্মের) ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ্ এদের একজনকে অন্যজনের ওপর (কিছু বিশেষ) মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং এ জন্য যে, (প্রধানত) তারাই (দাম্পত্য জীবনের জন্যে) নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।[১৯]

দুগ্ধ দানকারিনী জননীদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার ওপর হল সে সমস্ত নারীর খোরপোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী।[২০]

---

১৬. আল-কুরআন, ০২ : ১৯৫

১৭. আল-কুরআন, ০৪ : ২৯

১৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: ফাযলুন নাফা[illegible] আলাল আহ্‌ল, বৈরূত: দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৫০৩৭

১৯. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৪

অন্য আয়াতে গর্ভবতী স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾

(ঐ তালাকপ্রাপ্তা) নারীরা যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তাদের ভরণ-পোষণ করো।[২১]

পবিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে নবী স. বলেছেন:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

উত্তম সাদাকাহ হলো যা প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থেকে করা হয়। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্ব, তাদের থেকে আরম্ভ কর।[২২]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন:

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي

যাদের ভরণ-পোষণ তোমার যিম্মায় তাদের আগে দাও। (কেননা) স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও, নতুবা তালাক দাও। গোলাম বলবে, আমাকে খাবার দাও এবং কাজে খাটাও। ছেলে বলবে, আমাকে খাবার দাও, আমাকে তুমি কার কাছে রেখে যাচ্ছ?[২৩]

পিতামাতা সম্পর্কে আল-কুরআনে অনেক স্থানে বলা হয়েছে:

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا ﴾

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলবে না এবং তাদের ধমক দিবে না, সম্মানসূচক নম্রভাবে কথা বলবে।[২৪]

উলামায়ে কিরাম বলেন, এখানে সদাচার বলতে তাদের হক আদায় করা। যেমন ভরণ-পোষণ, আনুগত্য প্রদর্শন ইত্যাদি।[২৫] পিতামাতা তাদের সন্তানদের অর্থ-সম্পদ থেকে কতটুকু গ্রহণ করতে পারবে সে ব্যাপারে জমহুর ফকীহগণের মত হলো:

---

২০. আল-কুরআন, ০২ : ২৩৩

২১. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৬

২২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: উজূবুন নাফাকাতি আলাল আহলি ওয়াল ইয়াল, হাদীস নং-৫০৪১

২৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: উজূবুন নাফাকাতি আলাল আহলি ওয়াল ইয়াল, হাদীস নং-৫০৪০

২৪. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩

২৫. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্র. ড. আহমদ আলী প্রণীত *ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৩-৩৭

أَنَّ الْوَالِدَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ

পিতা তার সন্তানের সম্পদ থেকে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করতে পারবে।[২৬]

দলীল হিসেবে তারা এই হাদীসটি পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার।'[২৭]

কন্যা সন্তান ও বোনদের ব্যাপারে মহানবী স. বলেছেন:

لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة

যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন রয়েছে এবং সে তাদের সাথে সদাচরণ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৮]

৩. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ব্যয়

যাকাত থেকে সংগ্রহকৃত অর্থ-সম্পদ শরীয়াহ্ নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করা হবে। অভাবী মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ, তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান এবং মানব জীবনের সার্বিক লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদি উদ্দেশ্যে এ সব খাত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারণ করা হয়েছে। যা আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে; এ হল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২৯]

৪. সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়

বাধ্যতামূলক যাকাত ব্যবস্থার বাইরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় ব্যয় নির্বাহের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর ঐ ধরনের ব্যাপক ধারণা দিয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

---

২৬. এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। বিস্তারিত দ্র. *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৪৫, পৃ. ২০২-২০৩

২৭. ইমাম ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান,* তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায়: আত-তিজারাত, পরিচ্ছেদ : মা লির-রাজুলি মিন মালি ওয়ালিদিহি, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-২২৯১; হাদীসটির সনদ সহীহ।

২৮. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায়: আল-আবনা, পরিচ্ছেদ: মান 'আলা ছালাছা আখাওয়াত, বৈরূত: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ্, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি., হাদীস নং-৭৯; হাদীসটির সনদ হাসান।

২৯. আল-কুরআন, ০৯ : ৬০

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾

লোকজন কী ব্যয় করবে, সে সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরের জন্য। কল্যাণকর কাজের যা কিছু তোমরা কর না কেন, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত।[৩০]

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ নিজেদের ব্যয় নির্বাহে অক্ষম হলে ইসলাম সামর্থ্যানুসারে তাদের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে। কয়েদীদের জন্য ব্যয় করার বিষয়টি যদিও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে রূপ নিয়েছে, তবুও সমাজ সদস্যদের উপরও ইসলাম এর দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। তারা এ কাজ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾

আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও কয়েদীদের আহার্য দান করে। আর বলে, আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না।[৩১]

অন্য হাদীসে অসহায় বিধবাদের জন্য ভরণ-পোষণের কথা উল্লেখ করে মহানবী স. বলেছেন:

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর সিয়াম পালনকারীর মত।[৩২]

৫. প্রতিবেশীদের জন্য ব্যয়

ইসলাম প্রতিবেশীদের জন্য ব্যয় করতেও নির্দেশনা দিয়েছে। সমাজে বসবাসকারী অভাবী অন্যদের সাথে নিকট-প্রতিবেশী ও দূর-প্রতিবেশীদের সাহায্যে ব্যয় করার জন্যও আল-কুরআনে আদেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

---

৩০. আল-কুরআন, ০২ : ২১৫

৩১. আল-কুরআন, ৭৬ : ৮-৯

৩২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: ফাযলুন নাফাকাতি আলাল আহ্‌ল, হাদীস নং-৫০৩৮

আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে অপর কিছুকে শরীক করবে না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, নিঃস্ব, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, (অসহায়) মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর। আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৩৩]

মহানবী স. বলেছেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হয়।[৩৪]

নবী স. আবু যর গিফারী রা.-কে বলেন:

يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو أقسم في جيرانك

হে আবু যার, তুমি সুপ রান্না করলে তাতে পানি বেশি করে দাও এবং প্রতিবেশীদের মাঝে বিলাও।[৩৫]

তিনি আরও বলেন:

ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع

যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করে সে মুমিন নয়।[৩৬]

৬. দাস দাসী তথা চাকর চাকরাণীদের জন্য ব্যয়

মহানবী স. বলেছেন, وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ আর তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সাদাকা।[৩৭]

অধীনস্থ চাকরদের সম্পর্কে তিনি আরও বলেন,

هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ

এরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিত তাকে তাই

---

৩৩. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৬

৩৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি..., হাদীস নং-৫৬৭৩

৩৫. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায়: আল-জার, পরিচ্ছেদ: ইউকছারু মা-আল মুরুক ফাইউকসামু ফিল-জীরান, হাদীস নং-৭৯; হাদীসটির সনদ সহীহ।

৩৬. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায়: আল-জার, পরিচ্ছেদ: লা ইউশবাউ দূনা জারিহি, হাদীস নং-১১২; হাদীসটির সনদ সহীহ।

৩৭. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায়: আল-আবনা, পরিচ্ছেদ: ফাযলু মান 'আলা ইবনাতাহুল মারদূদাহ, হাদীস নং-৮২; হাদীসটির সনদ সহীহ।

খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরিধান করে থাকে। আর তাকে এমন কর্মভার দিবে না, যা তার সাধ্যাতীত। যদি কখনো তার উপর অধিক কর্মভার চাপানো হয় তবে যেন তাকে সাহায্য করে।[৩৮]

জাবির রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন:

أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ

তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা পরিধান করাও।[৩৯]

৭. মেহমানদের জন্য ব্যয়

ইসলামী শরীয়ায় মেহমানদারী অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অনেক আলিমের মতে, এটি ওয়াজিব এবং অধিকাংশ আলিমের মতে সুন্নাত। নবী করিম স. বলেছেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। একদিন এক রাত তার বিশেষ আপ্যায়ন হবে। সাধারণ আপ্যায়ন তিন দিন। আর এর অধিক হলে তা হবে সাদাকা। তবে মেজবানকে সংকটাপন্ন করা পর্যন্ত মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়।[৪০]

৮. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও দা'ওয়াতের জন্য ব্যয়

আল-কুরআন ও সুন্নাহের অনেক জায়গায় ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। 'আল্লাহর পথ' প্রত্যয়টি ব্যাপক। তবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামী দাওয়াতী কাজকে জোরদার করা ও এ উদ্দেশ্যে জিহাদের পথে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা। আল-কুরআনে এ ধরনের ইনফাকের জন্য বারবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর।[৪১]

---

৩৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: মা ইউনহা মিনাস সিবাব ওয়াল লা'ন, হাদীস নং-৫৭০৩

৩৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আয-যুহ্দ ওয়ার রাকাইক, পরিচ্ছেদ: হাদীসু জাবির আত-তাভীল..., বৈরুত: দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং-৭৭০৪

৪০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: ইকরামুয যায়ফি ওয়া খিদমাতুহু ইয়্যাহু বিনাফসিহি, হাদীস নং-৫৭০৩

৪১. আল-কুরআন, ০২ : ১৯৫

এভাবে আরো সরাসরি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন:

﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকার করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।[৪২]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।[৪৩]

অন্য আয়াতে ইনফাকের বিষয়টি ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(হে মুমিনগণ!) তোমরা অভিযানে বের হও, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জেনে থাক।[৪৪]

৯. অমুসলিমদের সাহায্যে ব্যয়

অমুসলিমদের মধ্যে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নয়; বরং শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের অভাবী ফকীর মিসকীনদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয় করা যাবে। আল-কুরআনে এ ধরনের ভাষ্য পাওয়া যায়। প্রথমে অমুসলিম ফকীরকে দান করতে মুসলিমরা ইতস্তত করতেন। তাই একটি আয়াতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন অভাবীকে দান করতে বলা হয়। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾

---

৪২. আল-কুরআন, ৫৭ : ০৭

৪৩. আল-কুরআন, ৫৭ : ১০

৪৪. আল-কুরআন, ০৯ : ৪১

তাদের হেদায়েত দান করার দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পিত হয়নি। আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন। তোমরা যে ধন সম্পদ দান করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যই তো অর্থ ব্যয় করে থাকো। কাজেই দান খয়রাত করে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং এক্ষেত্রে কোনক্রমেই তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না।[৪৫]

শায়খ আবু বকর আল-জাযায়িরী রহ. এই আয়াতটির তাফসীরে বলেন:

لما أمر تعالى بالصدقات ورغب فيها وسألها غير المؤمنين من الكفار واليهود فتحرج الرسول والمؤمنون من التصدق على الكافرين فأذهب الله تعالى عنهم هذا الحرج وأذن لهم بالتصدق على غير المؤمنين

আল্লাহ্ তা'আলা যখন দান করার আদেশ প্রদান করলেন তখন কিছু অমুসলিম কাফির ও ইয়াহুদী মুসলিমদের নিকট থেকে দান পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলো এবং চাওয়া শুরু করলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ স. ও মুমিনগণ কাফিরদের দান করা ঠিক মনে করলেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা (এই আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে) তাদের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে দিলেন এবং মুমিন নয় এমন লোকদেরকেও দান করার অনুমতি প্রদান করলেন।[৪৬]

১০. পশুপাখির জন্য ব্যয়

মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য জীবজন্তু তথা পশুপাখির খাদ্য ও অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ এসেছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই।[৪৭]

মহানবী স. বলেছেন:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

দয়ালুদের প্রতি দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন। পৃথিবীবাসীর প্রতি তোমরা দয়া কর, তা হলে আকাশবাসী (আল্লাহ)ও তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।[৪৮]

---

৪৫. আল-কুরআন, ০২ : ২৭২

৪৬. আবু বকর আল-জাযায়ির, *আইসারুত তাফাসীর লি-কালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর*, মদীনা মুনাওওয়ারাহ্: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রী., খ. ০১, পৃ. ৩১৭-৩১৮

৪৭. আল-কুরআন, ০২ : ২৭২

তবে আল্লাহ তা'আলার এ মহা সৃষ্টিজগতে সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা এমন মীযান বা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার প্রচলন করেছেন, যা সত্যি বিস্ময়কর। তাই মানুষ এমন কোন ভূমিকা নিবে না, যাতে এ ভারসাম্য নষ্ট হয়। তা ছাড়া, মানুষের অধীনস্থ ও কুক্ষিগত বা তাদের পালিত বা তাদের আশেপাশে বিচরণশীল জন্তু-জানোয়ার ও পাখিদের জন্য খাদ্যের সাধ্যমত ব্যবস্থা করে দিতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। এজন্য উট, ঘোড়া, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, শিকারে ব্যবহৃত কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে মহানবী স. নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

কোন মুসলিম যদি কোন গাছ লাগায়, তা থেকে কোন মানুষ বা জীবজন্তু যদি কিছু খায়, তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।[৪৯]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

একদা এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। তখন সে দেখলো যে, একটি কুকুর পিপাসার্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে এবং ভিজা মাটি চাটছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটি পিপাসায় সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে, যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কূপে নামলো এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভর্তি করে তুলে তা নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে আসলো এবং কুকুরটিকে তা পান করালো। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুর জন্যও কি আমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে? তিনি বলেন, প্রতিটি প্রাণধারী সৃষ্টির সেবার জন্য সওয়াব রয়েছে।[৫০]

---

৪৮. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায়: আল-বির্ ওয়াস সিলাহ্, পরিচ্ছেদ: রাহমাতুল মুসলিমীনা, বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-১৯২৪। হাদীসটির সনদ সহীহ।

৪৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: রাহমাতুন নাসি ওয়াল বাহায়িমি, হাদীস নং-৫৬৬৬

৫০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: রাহমাতুন নাসি ওয়াল বাহায়িমি, হাদীস নং-৫৬৬৩

ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় শর্ত ও ব্যবহারিক বিধান

ইসলামের কোন বিধানই ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদন করার অনুমতি নেই। যেকোন ইবাদতই আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ্ স. প্রদর্শিত শর্ত, নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুযায়ী করতে হয়। ইনফাক তথা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কুরআন ও সুন্নাহতে কিছু শর্ত, নীতিমালা ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইনফাক

ইসলামে যে কোন ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা আবশ্যক। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে বা উদ্দেশ্যে কোন কিছু ইনফাক করলে তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى - وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى - إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى - وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়; সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।[৫১]

২. অপব্যয় ও অপচয় না করা

ইসলামে অপব্যয় ও অপচয় সম্পূর্ণ হারাম। তাই ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়, কোন ক্ষেত্রেই অর্থ-সম্পদের অপব্যয় বা অপচয় করার বৈধ সুযোগ নেই। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর অবাধ্য।[৫২]

৩. কৃপণতা না করা

বৈধ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যয় না করাকেই সাধারণভাবে কৃপণতা বলা হয়। এটি মানবচরিত্রের অন্যতম খারাপ গুণ। কৃপণতাকে নিন্দা করে এবং কিয়ামতের দিন কৃপণের পরিণতি বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা যেন কোন অবস্থায় তারা মঙ্গলজনক মনে না করে। বরং এটা

---

৫১. আল-কুরআন, ৯২ : ১৮-২১

৫২. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।[৫৩]

৪. মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

ইসলামী জীবনব্যবস্থা মধ্যমপন্থা অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করে। অর্থনৈতিক জীবনেও এই নীতি প্রযোজ্য। অপব্যয় বা অপচয় এবং কৃপণতা- উভয়টিই ইসলামে নিষিদ্ধ। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾

তারা যখন ব্যয় করে অপব্যয় করে না, আর কৃপণতা দেখায় না। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।[৫৪]

৫. সামর্থ্য অনুসারে ব্যয় করা

সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন সচ্ছলতা।[৫৫]

৬. হালাল খাতে ব্যয় করা

ইসলাম সুদ, ঘুষ, জুয়া, মাদকদ্রব্য ক্রয়, মূর্তিপূজার বেদী নির্মাণ, ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম কাজে সম্পদ ব্যয় করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মদ নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে মহানবী স. এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

যিনি মাদ পানকে হারাম করেছেন তিনিই তা বিক্রি করাও হারাম করেছেন।[৫৬]

তা ছাড়া কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আদমসন্তান যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে এক কদমও নড়তে পারবে না সে প্রশ্নসমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন দুটি হবে, তুমি

---

৫৩. আল-কুরআন, ০৩ : ১৮০

৫৪. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৭

৫৫. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৭

৫৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ: তাহরীমু বায়ইল খামর, হাদীস নং-৭৭০৪

তোমার অর্জিত সম্পদ কোন পথে (হালাল না হারাম) উপার্জন করেছো এবং কোন কাজে ব্যয় করেছো?[৫৭]

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একজন ব্যক্তি তার ইচ্ছামত পথে বা কাজে তার সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না। তাকে অবশ্যই হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করে হালাল পথেই ব্যয় করতে হবে।

৭. হালাল মাল থেকে ব্যয় করা

উপার্জিত সম্পদ যতক্ষণ না হালাল হিসেবে সাব্যস্ত হবে ততক্ষণ তা থেকে ব্যয় করে কোন লাভ নেই। কারণ পবিত্র তথা হালাল অর্থ-সম্পদ থেকে ব্যয় করার আদেশ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর। আর তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না।[৫৮]

এ বিষয়ে নবী স. বলেছেন:

وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ

কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ পন্থায় হারাম মাল উপার্জন করে তা খরচ করে এবং তাতে বরকত দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সে যদি এই মাল থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে, তবে এতে বরকত হবে না। যদি সে হারাম মাল ত্যাজ্য সম্পদ হিসাবে রেখে যায়, তবে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দের মাধ্যমে দূরীভূত করেন না। (অর্থাৎ হারাম মালের সাদাকা কারো পাপ মোচনের কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় না।) কিন্তু তিনি মন্দকে সৎ কর্মের দ্বারা পরিচ্ছন্ন করেন। কেননা কোন নাপাক অপর নাপাককে দূরীভূত করতে পারে না।[৫৯]

---

৫৭. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, হাদীস নং-২৪১৬। হাদীসটির সনদ হাসান।
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ "

৫৮. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৭

৫৯. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরুত: মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ৬, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং- ৩৬৭২; আল-আলবানীর মতে হাদীসটির সনদ যয়ী'ফ, আদ-দারাকুতনী হাদীসটির সনদকে মাওকূফ সহীহ বলেছেন।

৮. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে ব্যয় করা

অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য-এ দুভাবেই ব্যয় করার অনুমোদন রয়েছে। এ মর্মে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই।[৬০]

প্রকাশ্যে ব্যয় করলে কিছু উপকার আছে, যেমন তাকে দেখে অন্যরা উৎসাহিত হয়। কিন্তু এতে দান গ্রহীতার মন ছোট হয়ে যায় এবং সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। এছাড়া দাতার মাঝে লোকদেখানো ভাব জন্ম নিতে পারে। কিন্তু গোপনে দিলে তা হয় না। গ্রহীতার সম্মান এতে রক্ষা পায়। তাই গোপনে দান প্রশংসিত। এই মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল।[৬১]

৯. সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করা

অর্থ-সম্পদের প্রতি মায়া ও মোহ সচ্ছল অবস্থায় দান করতে বাধা দেয়। আবার অর্থ-সম্পদের অভাব-অনটন থাকাবস্থায় দান করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ইসলামে প্রয়োজন বা পরিস্থিতির আলোকে সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায়ই ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। যারা সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে তাদেরকে 'মুহসিন' তথা সৎকর্মশীল আখ্যা দিয়ে তাদেরকে ভালবাসেন মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।[৬২]

---

৬০. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৯

৬১. আল-কুরআন, ০২ : ২৭১

৬২. আল-কুরআন, ০৩ : ১৩৪

১০. ইনফাকের পর খোঁটা ও কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়

কাউকে কিছু দান করার পর তাকে এই দানের খোঁটা দেয়া উচিত নয়। এ মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

যারা তাদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।[৬৩]

১১. ইনফাকের পর রিয়া করা অনুচিত

রিয়া বা লোকদেখানোর নিয়াত যে কোন ভালো কর্মকে ধ্বংস করে দেয়। এ ধরনের আমল আল্লাহ্র নিকট তো কবুল হয়ই না; বরং শিরকের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। যারা লোক দেখানোর জন্য দান করে তাদের দানের অবস্থা কেমন হবে তার উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

হে মুমিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[৬৪]

১২. সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ ব্যয় করা উত্তম

নিজের সম্পদসমূহ থেকে প্রিয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত সর্বোচ্চ পুণ্য লাভ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾

তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা ব্যয় কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।[৬৫]

---

৬৩. আল-কুরআন, ০২ : ২৬২

৬৪. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৪

৬৫. আল-কুরআন, ০৩ : ৯২

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর বিশিষ্ট সাহাবী আবু তালহা রা. তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ 'বায়রূহা' বাগানটি ওয়াকফ হিসেবে দান করে দেন।[৬৬]

১৩. মৃত্যু আসার পূর্বেই ইনফাক

কারো মৃত্যু আসার পূর্বে দান না করলে সে দান কবুল হবে না। অনেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে দান করতে চান। যখন মৃত্যু এসে যায় তখন বলে, আমাকে যদি আর কিছুক্ষণ সময় দেয়া হতো তাহলে আমি দান করতাম। এই অবস্থায় দান করলে সেই দান আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না। তাই এই মৃত্যুর পূর্বেই দান করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

আমি তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই। অন্যথায় মৃত্যু আসলে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম![৬৭]

উপসংহার

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, যেখানে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ার সুযোগ নেই। যাকাতের মত ফরয আর্থিক খরচ থেকে শুরু করে নফল বা অতিরিক্ত অনেক আর্থিক খরচের বিধিবিধান এই জীবনব্যবস্থায় আলোচিত হয়েছে। ধনবৈষম্যের এই পৃথিবীতে সম্পদ বণ্টনে ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে বৈষম্য নিরসনের লক্ষে ইসলাম মানবজীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের ইনফাকের কথা বলেছে। এর সাথে সাথে মানবসমাজের কল্যাণে সঠিক পন্থায় ইনফাকের নির্দেশ দিয়েছে। ইনফাকের মাধ্যমে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে মুক্তি ও কল্যাণ অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার প্রচলন করেছে। ইসলামী নীতিমালা অনুসারে ইনফাক (সম্পদ ব্যয়) করা হলে মানবজাতির সুখ, শান্তি ও কল্যাণ অর্জন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

---

৬৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ্*, অধ্যায়: আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ: আয-যাকাত আলাল আকারিব, হাদীস নং-১৩৯২

৬৭. আল-কুরআন, ৬৩ : ১০

REG.NO.DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: JANUARY-MARCH : 2016 : Tk. 100/-